যক্ষপতির রত্নপুরী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

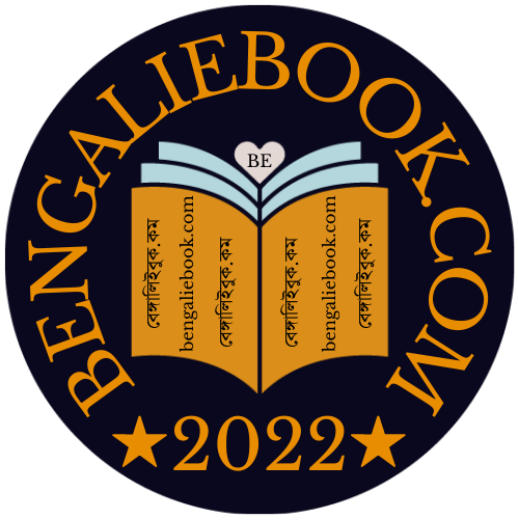

যক্ষপতির রত্নপুরী

প্রথম পরিচ্ছেদ। চিনে হোটেলে

অনেকে অভিযোগ করেন, আমার জীবন নাকি অস্বাভাবিক। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক মানুষের জীবন এমন ঘটনাবহুল হতে পারে না।

যদিও নিজেকে আমি পাগল বা গণ্ডমূর্খের মতো নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করছি।, তবে তর্কের খাতিরে এখানে কেবল এই প্রশ্ন বোধহয় করতে পারি, নেপোলিয়ন কি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না? তিনি মাত্র বাহান্ন বৎসর বেঁচে ছিলেন। তার ভেতর থেকে প্রথম পঁচিশ বৎসর অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি মাত্র সাতাশ বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়নের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যে ঘটনার-পর-ঘটনার প্রচণ্ড বন্যা, তাদের অবলম্বন করে কি অসংখ্য নাটক ও উপন্যাস রচনা করা চলে না?

না হয় নেপোলিয়নের মতন মহামানুষ ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কথা ছেড়ে দি, কারণ তাঁর জীবনে ঘটনা ঘটবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল প্রচুর। তার বদলে আমি মধ্যযুগের এক শিল্পীর কথা উল্লেখ করতে চাই। তাঁর নাম বেভেনুতো শেলিনি। তিনি ছিলেন ইতালির এক বিখ্যাত ভাস্কর ও ওস্তাদ স্বর্ণকার। তিনি একখানি প্রসিদ্ধ আত্মচরিতও লিখে গেছেন। সাধারণত শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার-এর সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে। কিন্তু বেভেনুতোর ঘটনাবহুল জীবনকাহিনি জোগাতে পারে বহু বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর ও প্রায় অসম্ভব উপন্যাসের উপকরণ। এজন্যে তাঁর আত্মচরিতকে অস্বাভাবিক বলে অভিযোগ করা চলে না। কারণ, তাঁর জীবনের ঘটনাবলি সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

এক-একজন মানুষের জীবনই হচ্ছে এমনি বিচিত্র! হয় ঘটনাপ্রবাহ আকর্ষণ করে তাদের জীবনকে, নয় তাদের জীবনই আকর্ষণ করে ঘটনাপ্রবাহকে।

.

বরাবরই লক্ষ করে দেখছি, আমি স্বেচ্ছায় কোনও রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টি করতে না চাইলেও, কোথা থেকে আচম্বিতে আমার জীবনের ওপরে এসে ভেঙে পড়েছে অদ্ভুত সব ঘটনার প্রবাহ। আমার বন্ধু কুমার হয়তো এসব ঘটনাচক্রের বাইরেই পড়ে থাকত, কিন্তু সে হচ্ছে আমার নিত্যসঙ্গী, তার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কাজেই তাকেও জড়িয়ে পড়তে হয় এইসব ঘটনার পাকে-পাকে। অর্থাৎ প্রবাদে যাকে বলে–পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

এবারেও কেমন করে আমরা নিজেদের অজান্তেই হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা আক্রান্ত হলুম, এইখানে সেই কথাই লিখে রাখছি?

সেদিন সন্ধ্যায় কুমার এসে বললে, কী সব বাজে বই নিয়ে মেতে আছ? চলো, আজ কোনও হোটেলের দিকে যাত্রা করি।

বই মুড়ে বললুম, আপত্তি নেই। কিন্তু কোন হোটেলে?

সেটা তুমিই স্থির করো।

চৌরঙ্গির দিশি আর বিলিতি হোটেলে খেয়ে-খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। চল আজ ছাতাওয়ালা গলির চিনে-পাড়ায়।

ন্যানকিনে? সেও তো বিলিতির নকল।

না-হে-না, আমরা যাব খাঁটি চিনে হোটেলে, খাঁটি চিনে খানা খেতে।

উত্তম প্রস্তাব। রাজি!

বাইরে বেরুবার জামাকাপড় পরছি দেখে বাঘাও গাত্রোত্থান করে গৃহত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হল।

কুমার বললে, ওরে বাঘা, আজ আর তুই সঙ্গে আসিস নে। হোটেলওয়ালারা বদ রসিক রে, কুকুর-খদ্দের হয়তো পছন্দ করবে না!

কিন্তু বাঘা মানা মানতে রাজি নয় দেখে রামহরিকে স্মরণ করলুম।

রামহরি এসে বললে, দুই স্যাঙাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

চিনে হোটেলে খানা খেতে।

সর্বনাশ! চিনেরা তো তেলাপোকা খায়! তোমাদেরও খাবার শখ হয়েছে নাকি?

রামহরি, চিনেম্যানদের নামে ও-অপবাদটা একেবারেই মিথ্যে। তারা তেলাপোকা খায় না, তবে পাখির বাসার ঝোল খায় বটে!

রাম-রাম! পাখির বাসাও আবার খাবার জিনিস নাকি?

তবু তুমি তাদের আর একটা খানার নাম শোনোনি। তারা পঞ্চাশ, ষাট, আশি, একশো বছরের পুরোনো ডিম খেতে ভারি ভালোবাসে।

ওয়াক! ও খোকাবাবু, শুনেই যে আমার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত উঠে আসছে। ওয়াক!

হাঙরও তাদের কাছে সুখাদ্য।

পায়ে পড়ি খোকাবাবু, আর বোলো না! ছি-ছি, ওইসব ছিষ্টিছাড়া খাবার তোমরা খেতে চাও?

না রামহরি, হাঙর বা একশো বছরের পচা ডিম খাবার সৎসাহস আজও আমাদের হয়নি। তবে বাঘা বোধহয় হাঙর পেলে ছাড়বে না, ওকে তুমি সামলাও।

আমি আর কুমার বেরিয়ে পড়লুম।

.

চিনে-পাড়ার খাঁটি চিনে-হোটেলে বাঙালির দেখা পাওয়া যায় না। আর কিছুই নয়, রামহরির মতন অধিকাংশ বাঙালিরই আসল চিনে হোটেল সম্বন্ধে ভয়াবহ কুসংস্কার আছে– তাই তাদের দৌড় বড়জোর ন্যানকিন বা চাঙ্গুয়া পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা যে চিনে-হোটেলে গেলুম সেখানে ভয় পাওয়ার বা বমন ওঠবার মতন কিছুই ছিল না। চারিধার সাজানো-গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাবারগুলিও সুস্বাদু–যদিও আমাদের দেশি-বিলাতি খাবারের সঙ্গে তাদের কিছুই মিল নেই। পরিবেশন করছিল একটি চিনে মেয়ে।

সর্বশেষে মেয়েটি নিয়ে এল চিনে চা। এ চা তৈরি করবার পদ্ধতিও অন্যরকম। মেয়েটি দুটি কাচের বা পোর্সিলিনের বাটি আনলে। একটি বাটিতে গরম জল ঢেলে তাতে শুকনো বা পাকানো একখণ্ড চায়ের পাতা দিয়ে ওপরে দ্বিতীয় বাটিটি চাপা দিয়ে চলে গেল। মিনিট তিন-চার পরে সে ফিরে এসে উপুড় করা বাটিটি নামিয়ে দিতেই দেখি, সেই গুটান চায়ের পাতাখানি সমস্ত বাটি ভরে ছড়িয়ে পড়ে জলের ওপরে ভাসছে। ব্যস, চা প্রস্তুত– এখন খালি চিনি মেশাও আর চুমুক দাও। কিন্তু এ চায়ের স্বাদ অধিকাংশ বাঙালিরই ধাতে সইবে না।

কুমার চায়ের পেয়ালা তুলে বললে, বিমল, চিনে-হোটেলের ভেতর বসে চিনে খানা খেতে-খেতে আর চুং চাংচুং চিং কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছে, আমরা যেন আরব্য উপন্যাসের মায়া-গালিচায় চেপে হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চিনদেশেই এসে পড়েছি। ও পাশের ঘরে ওই চিনেম্যানদের দেখছ? ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে কথাবার্তা কইছে বটে, কিন্তু ওদের মুখে কোনও ভাবের ছাপ নেই–ওরা যেন, রহস্যময় মূর্তি।

কুমারের কথা ফুরুতে-ফুরুতেই আমার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হল।

ঠিক আমাদের পাশের ঘরেই জাগল হঠাৎ এক ক্রুদ্ধ গর্জনসঙ্গে-সঙ্গে বিষম হুড়োহুড়ি ও চেয়ার-টেবিল উলটে পড়ার শব্দ। তারপরেই এক আর্তনাদ!

রাত্রিবেলায় এই চিনে-পাড়া মারামারি হানাহানির জন্যে বিখ্যাত। পাছে অন্যের হাঙ্গামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভয়ে আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম।

পর মুহূর্তেই একটা মাঝবয়সি রক্তাক্ত চিনেম্যানের মূর্তি টলতে টলতে আমাদের কামরার কাছ বরাবর এসে হেলে পড়ে গেল এবং তার দেহটা এসে পড়ল কামরার ভেতরে একেবারে কুমারের বুকের ওপরে।

তারপরেই দেখলুম আমাদের কামরার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল প্রায় আট-দশজন। চিনেম্যান-তাদের চেহারা দেখলে ভালোমানুষের প্রাণ ধড়ফড় করে উঠবে। কিন্তু আমরা দুজনেই ভালোমানুষ নই।

সব আগে রয়েছে, লম্বায় না হোক চওড়ায় মস্ত বড় এক মূর্তি, তার ডানহাতে একখানা আধ হাত লম্বা রক্তমাখা ছোরা। সেইখানা উঁচিয়ে সে আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়বার উপক্রম করলে!

মারলুম এক ঘুসি ঠিক চোয়ালের ওপরে-আমার গায়ের সব শক্তি ছিল সেই মুষ্টির পিছনে। কারণ, আমি জানি, মারামারির সময়ে দরদ করে মারলে ঠকতে হয় নিজেকেই।

লোকটা ঠিকরে পড়ে গেল ঠিক বজ্রাহতের মতোই।

তারপরেই শুনলুম অনেকগুলো ভারী-ভারী জুতোর দ্রুত শব্দ! চোখের পলক পড়তে না-পড়তেই আমাদের ঘরের সামনে থেকে সমস্ত জনতা হল অদৃশ্য! কিন্তু পরমুহূর্তেই হোটেলের অন্যদিকে আবার নতুন গোলমাল উঠল কাদের সঙ্গে আবার কাদের মারামারি ঝটাপটি চলছে! খুব সম্ভব পুলিশ এসে পড়েছে।

এতক্ষণে কামরার ভেতরে নজর দেওয়ার সময় হল।

কুমার তখন আহত লোকটাকে মাটির ওপরে শুইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলুম, আর কোনও আশা নেই।

লোকটাও বুঝেছিল। তবু সেই অবস্থাতেও সে চোখ নেড়ে আমাকে তার কাছে যাওয়ার জন্যে ইশারা করলে। আমি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলুম।

নিশ্বাস টানতে টানতে অস্ফুট স্বরে ইংরেজিতে সে বললে, আমি আর বাঁচব না। আমার জামার বোতাম খুলে ফ্যালো।

তাই করলুম।

আমার গলায় ঝুলছে একখানা লকেট। সেটা তাড়াতাড়ি বার করে নাও।

লকেটখানা বার করতেই সে বললে, লুকিয়ে রাখো! ছুন-ছিউ দেখতে পেলে তুমিও বাঁচবে না।

ছুন-ছিউ কে?

সে প্রথমটা উত্তর দিতে পারলে না, কেবল হাঁপাতে লাগল। তারপর অনেক কষ্টে থেমে থেমে বললে, যে আমাকে মেরেছে।...কিন্তু আমি যখন মরবই...গুপ্তধন তাকেও ভোগ করতে দেব না...হ্যাঁ, এই আমার প্রতিশোধ..মাটির ভেতরে... গুপ্তধন তার কথা বন্ধ হল, সে চোখ মুদলে।

ভাবলুম, লোকটা বোধহয় এ জন্মের মতন আর কথা কইতে পারবে না। কুমার বললে, এ কী বলছে, বিমল? কিছুই তো বোঝা গেল না! গুপ্তধন কোথায় আছে?

লোকটা আবার চোখ খুললে। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে টেনে-টেনে বললে, কি-পিন..কি পিন...সেখানে যেও..কি-পিন। হঠাৎ তার বাক্যরোধ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ কপালে উঠে স্থির হয়ে গেল! ...

বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, তার হৃৎপিণ্ড আর নড়ছে না।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কি-পিন কাহিনি

খুনোখুনি, হানাহানি বা কোনওরকম রোমাঞ্চকর কাণ্ডের কথা পর্যন্ত আমি ভাবিনি, কিন্তু দ্যাখো একবার ব্যাপারখানা! এখানেও ছোরাছুরি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি? আবার গুপ্তধন-আবার দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, কি-পিন? আবার বুঝি আমার চির-চঞ্চল দুষ্টগ্রহটি সজাগ হয়ে উঠেছেন কলুর বলদের মতো আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারবার জন্যে?

কুমার ব্যস্তভাবে বললে, চটপট সরে পড়ি চল ভায়া। নইলে পুলিশ হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে।

হোটেলের একদিক থেকে তখনও আসছিল প্রচণ্ড ছুটোছুটি হুড়োহুড়ির শব্দ, নিশ্চয় গুণ্ডাদের সঙ্গে চলছে পুলিশের দাঙ্গা।

সেই ফাঁকে আমরা সরে পড়লুম। সদর দরজার কাছেও পুলিশের লোক ছিল, বোধহয় আমাদের বাঙালি দেখেই বাধা দিল না।

একেবারে সিধে বাড়িতে এসে উঠলুম।

হতভাগা রামহরি বুড়ো হয়েছে, তবু তার চোখের জেল্লা কি কম? আমাদের দেখেই বললে, কার সঙ্গে মারামারি করে আসা হল শুনি?

কে বললে আমরা মারামারি করেছি?

থামো খোকাবাবু, মিছে কথা বলে আর পাপ বাড়িও না। নিজেদের জামাকাপড়ের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো দেখি। ও আবার কি? কুমারের জামায় যে রক্তের দাগ!

কুমার হেসে বললে, ধন্যি তুমি রামহরি! পাহারাওয়ালার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলুম, কিন্তু।

কী সর্বনাশ! এর মধ্যে আবার পাহারাওয়ালাও আছে? এই বুঝি তোমাদের খেতে যাওয়া? এমন সব খুনে ডাকাত নিয়ে আর যে পারা যায় না। হাড় যে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। জামা-টামা খুলে ফ্যালো, দেখি কোথায় লাগল?

বাঘাও ঘরের কোণে বসে আমাদের লক্ষ করছিল। রামহরির কথাবার্তা শুনে ও হাবভাব দেখে তারও মনে বোধহয় কেমন সন্দেহ জাগল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমাদের জামাকাপড় শুঁকতে শুরু করে দিলে।

কোনগতিকে মানুষ রামহরি ও পশু বাঘার কবল ছাড়িয়ে, জামাকাপড় বদলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

কুমার বললে, এইবার ধুকধুকিখানা বের করো দেখি।

কুমারের মুখের কথা বেরুতে-না-বেরুতেই হোটেলের সেই হতভাগ্য চিনেম্যানের দেওয়া লকেটখানা আমি বার করে ফেললুম–সেখানাকে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে আমারও মনের কৌতূহল রীতিমতো অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সাধারণত ধুকধুকি বা লকেটের আকার যেরকম হয়, এখানা তার চেয়েও বড়। রূপোয় তৈরি এই ধুকধুকির ওপরকার কারুকার্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এ হচ্ছে বিখ্যাত হুনুরি চিনে কারিগরের কীর্তি!

কারিকুরির মধ্যে মাঝখানে একটি মূর্তি আঁকা রয়েছে। মূর্তিটি এত ছোট যে, ভালো করে দেখবার জন্যে অণুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হল।

পাকা শিল্পী এতটুকু জায়গার মধ্যে অতি সূক্ষ্মরেখায় সম্পূর্ণ নিখুঁত পাকা মূর্তি এমন কায়দায় খুদে ফুটিয়ে তুলেছে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু কী কুৎসিত মূর্তি! মস্ত ভুড়িওয়ালা মোটাসোটা এক চেহারা, দুই চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে যেন ঐশ্বর্যের বা ক্ষমতার দর্প, মুখের ফাঁক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বড়-বড় আটটা দাঁত এবং পা রয়েছে তিনখানা!

বললুম, কুমার, এ হচ্ছে কোনও খেয়ালি শিল্পীর উদ্ভট কল্পনা, এর মধ্যে কিছু বস্তু নেই। এইবার ধুকধুকির ভেতরটা দেখা যাক।

আঙুলের চাপ দিতেই ধুকধুকির ডালা খুলে গেল। ভেতরে রয়েছে একখানা ভাঁজ করা খুব পুরু কাগজ-প্রায় কার্ড বললেও চলে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। যদিও তার ওপরে কোন লেখা নেই, তবু একটা নতুনত্ব আছে বটে!

চামড়ার বা ধাতুর চাদরের ওপরে যেমন নকশা emboss করা থাকে, এর ওপরেও রয়েছে তেমনি উঁচু করে তোলা কতকগুলো ডট বা বিন্দু। কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাও চারটে বা আরও বেশি বিন্দু।

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, ও বিমল, এ আবার কীরকম ধাঁধা হে?

চিনে ধাঁধা হওয়াই সম্ভব। বাঙালির মাথায় ঢুকবে না।

ধুকধুকির ভেতর থেকে আর কিছুই আবিষ্কার করা গেল না।

কিন্তু বিন্দুগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও অর্থ আছে, নইলে এত যত্নে কেউ এই কাগজখানাকে ধুকধুকির ভেতরে পুরে রেখে দিত না। সেই মৃত চিনেম্যানটা মরবার আগে যে দু-তিনটে কথা বলে গিয়েছিল তার দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, ছুন-ছিউ নামে কোনও

দুরাত্মা তাকে আক্রমণ করেছিল এই ধুকধুকির লোভেই। সে এমন ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে, কি-পিন নামক স্থানে গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, আর তার রহস্য এই ধুকধুকির মধ্যেই লুকোনো আছে।

কুমার বললে, বিমল, প্রথমে যখন আমরা রূপনাথ গুহায় গুপ্তধন (আমার লেখা যকের ধন উপন্যাস দষ্ট্রব্য। ইতি-লেখক) আনতে যাই, তখন মড়ার মাথায় সাঙ্কেতিক লিপির পাঠ উদ্ধার করেছিলে তুমিই। এ বিষয়ে তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভালো করে ভেবে দ্যাখো, এবারেও তুমি সফল হবে।

এক ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেল, বিন্দুগুলো নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করলুম, কিন্তু ব্যর্থ হল আমার সকল চেষ্টাই।

শেষটা সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললুম, চুলোয় যাক ধুকধুকির রহস্য! তার চেয়ে কি পিন কথাটা নিয়ে আলোচনা করি এসো। কি-পিন কোথায়?

কুমার বললে, কি-পিন হয়তো চিনে মুল্লুকের কোন জায়গা।

অসম্ভব। যাও তো কুমার, আমার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসো এনসাইক্লোপিডিয়া আর গেজেটিয়ার!

কুমার তখনি ছুটে গেল আর বই নিয়ে ফিরে এল। দুজনে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু কোনও ফলই হল না। কোথাও কি-পিন নামে কোনও দেশের কথাই লেখা নেই।

কুমার বললে, মরবার সময়ে সেই চিনে বুড়ো যে আমাদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করে গেছে, এ কথা বিশ্বাস হয় না! কি-পিন বলে কোনও জায়গা নিশ্চয়ই আছে।

আমি বললুম, থাকতে পারে। কিন্তু হয়তো সেটা তুচ্ছ গণ্ডগ্রাম। বাইরের কেউ তার কথা জানে না।

সেদিন এই পর্যন্ত। কুমার বাড়ি ফিরে গেল। আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের ঘোর এসে মুছে দিলে কি-পিন, ধুকধুকি আর গুপ্তধনের রহস্য!

.

পরের দিন সকালবেলা। আমি আর কুমার চা পান করছি, বাঘাও এসে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে তার প্রভাতী দুধের বাটির লোভে।

এমন সময়ে কমলকে নিয়ে বিনয়বাবু এলেন। যাঁরা আমাকে চেনেন এ দুজনের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তাদের পরিচয় আছে। সকালবেলায় পরীক্ষা করতে করতে ধুকধুকিখানা চায়ের টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছিলুম, বিনয়বাবু এসেই সেখানা দেখতে পেয়ে বললেন, ওটা কিহে, বিমল?

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ল বিনয়বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা। সারাজীবন ধরে তিনি জ্ঞানসমুদ্রের ডুবুরির কাজ করে আসছেন। আজ বয়সে পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তবু বিদ্যাচর্চা ছাড়া আর কোনও আনন্দই তার নেই। তিনি হচ্ছেন আশ্চর্য এক বৃদ্ধ ছাত্র এবং এই বিশ্ব হচ্ছে তার কাছে বিদ্যালয়ের মতো। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব– যে-কোনও বিষয়। নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছি, কখনও সঠিক উত্তরের অভাব হয়নি। কুমার তো তার নাম রেখেছে–

জীবন্ত অভিধান। কাজেই তাকে পেয়ে আশান্বিত হয়ে ধুকধুকিটা তাড়াতাড়ি তার হাতে তুলে দিলুম।

বিনয়বাবুর দুই চোখ ধুকধুকির দিকে চেয়েই কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, আরে, এরকম লকেট তো কখনও দেখিনি। এটা তো এদেশে তৈরি নয়! হুঁ, চিনের জিনিস। কোথায় পেলে?

এক চিনেম্যানের দান। কিন্তু ওপরের ওই মূর্তিটা কি অদ্ভুত দেখেছেন?

অদ্ভুত? হা, মূর্তির মুখখানা চিনে ছাঁদের বটে, কিন্তু আসলে এ হচ্ছে আমাদেরই পৌরাণিক মূর্তি!

সবিস্ময়ে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, এ হচ্ছে হিন্দু যক্ষরাজ কুবেরের চেহারা। অষ্টদন্ত, তিনপদ। উদ্ভট, কুৎসিত চেহারার জন্যেই যক্ষরাজের নাম হয়েছে কুবের। তবে ঐশ্বর্যের মহিমায় তাঁর শ্রীহীনতার দুঃখ বোধহয় দূর হয়েছে।

কুমার বললে, বিনয়বাবু, আপনি কুবেরকে তো চিনলেন। কিন্তু বলতে পারেন, কি পিন বলে কোনও জায়গা আছে কি না?

বিনয়বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কি-পিন?...কি-পিন। হুঁ, নামটা শুনেছি বোধ হয়। বুড়ো হয়েছি, ফস করে সব কথা স্মরণ হয় না। রোসো ভায়া, মনে করবার জন্যে একটু সময় দাও।

আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মিনিট তিনেক পরেই সমুজ্জ্বল মুখে বিনয়বাবু বললেন, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! কিন্তু কি-পিন নিয়ে তোমাদের এমন আশ্চর্য মাথাব্যথা কেন? তোমরা কি আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ?

কি-পিন বা কা-পিন হচ্ছে অনেক শতাব্দী আগেকার নাম। নামটি দিশিও নয়, চিনে। সপ্তম শতাব্দীতে কি-পিন বলতে বোঝাত উত্তর পূর্ব আফগানিস্তানের কপিশ নামে জায়গাকে। তার আগে আর-এক সময়ে ভারত সীমান্তের গান্ধার প্রদেশকেও কি-পিন বলে ডাকা হত। চিনে লেখকরা ভারতের আরও কোন-কোন দেশকে কি-পিন বা কা-পিন নামে জানতেন। তোমরা কোন কি-পিনের কথা জানতে চাও বুঝতে পারছি না। তবে সপ্তম

শতাব্দীর কি-পিন সম্বন্ধে বড়-বড় ঐতিহাসিক একটি অদ্ভুত গল্প বলেছেন, তোমাদের ধুকধুকির ওপরে কুবেরের মূর্তি দেখে সেটা আমার মনে পড়ছে।

আমি বললুম, আচ্ছা বিনয়বাবু, আগে গল্পটাই শুনি।

বিনয়বাবু চেয়ারের ওপরে হেলে পড়ে বলতে লাগলেন, এই ঐতিহাসিক গল্প নিয়েও অল্পবিস্তর মতান্তর আছে, ও সব গোলমালের মধ্যে ঢুকে দরকার নেই। চিনা পর্যটক হুয়েন। সাংয়ের ভ্রমণ আর জীবনকাহিনিতে যে গল্পটি আছে, সেইটিই তোমাদের কাছে বলব। ভিনসেন্ট এ, স্মিতের Early History of India নামে বিখ্যাত ইতিহাসেও (২৭৯ পৃ.) এ গল্পটি পাবে। কিন্তু গল্পটি বলবার আগে আমাকে আরও কয়-শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে।

শক জাতীয় কণিষ্ক তখন ভারত সম্রাট। দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। তখন সারা এশিয়ায় চিনাদের বড় প্রভুত্ব। শকেরা ভারত দখল করেও চিনাদের কর দিতে বাধ্য ছিল। দু-একবার বিদ্রোহ প্রকাশ করেও চিনাদের কাছে তারা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। সম্রাট কণিষ্কই সর্বপ্রথমে চিনাদের জাঁক ভেঙে দিলেন। তিনি কেবল কর দেওয়াই বন্ধ করলেন না, তিব্বত ছাড়িয়ে চিনা সাম্রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়ে দেশের পর দেশ জিতে তবে ফিরে এলেন এবং আসবার সময়ে জামিন স্বরূপ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চিনাদের কয়েকজন রাজপুত্রকে–কেউ-কেউ বলেন, তাদের মধ্যে চিন-সম্রাটের এক ছেলে ছিলেন।

আফগানিস্থানকে সে সময়ে ভারতেরই এক প্রদেশ বলে ধরা হত। চিন রাজপুত্ররা শীতের সময়ে পাঞ্জাবে থাকতেন, আর গরমের সময়ে থাকতেন আফগানিস্থানে, শা–লো– কা নামে বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের এক মঠে। এই মঠটি ছিল কপিশ পাহাড়ের এক ঠান্ডা উপত্যকায়। একথা বোধহয় না বললেও চলবে যে, তখন পৃথিবীতে মুসলমান ধর্মের সৃষ্টি হয়নি। আফগানিস্থানে তখন বাস করতে হিন্দু আর বৌদ্ধরাই। আজও আফগানিস্থানের চারিদিকে তখনকার বৌদ্ধমঠের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে চিন-রাজপুত্রদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে তারা শালোকা বা কপিশ মঠকে দান করে গেলেন বিপুল বিত্ত, তাল-তাল সোনা, কাঁড়ি কড়ি মণিমুক্তা! সেকালের সেই ঐশ্বর্যের পরিমাণ একালে হয়তো হবে কোটি-কোটি টাকা! চিন- রাজপুত্ররা কেবল টাকা দিয়েই গেলেন না, ভারতকে শিখিয়ে গেলেন নাসপাতি ও পিচফল খেতেও। তারা আসবার আগে এ অঞ্চলে ও দুটি ফলের ফসল ফলত না।

এইবার হুয়েন সাংয়ের কথা। তিনি ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। শালোকা বা কপিশ মঠে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে গিয়ে বর্ষাকালটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অত দিন পরেও মঠের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দ্বিতীয় শতাব্দীর সেই চিন-রাজপুত্রদের অসাধারণ দানের কথা নিয়ে হুয়েন সাংয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেননি।

সন্ন্যাসীরা আর-এক বিষয় নিয়ে হুয়েন সাংয়ের কাছে ধরনা দিলেন। সন্ন্যাসীরা বললেন, কপিশ মঠে যক্ষরাজ কুবেরের প্রকাণ্ড এক পাথরের মূর্তি আছে। এবং তারই পায়ের তলায় পোঁতা আছে চিন-রাজপুত্রদের দেওয়া অগাধ ঐশ্বর্য।

সেই ঐশ্বর্য উদ্ধার করবার জন্যে হুয়েন সাংকে অনুরোধ করা হল। হুয়েন সাং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা যখন গুপ্তধনের সন্ধান জানেন, তখন আমাকে অনুরোধ করছেন কেন? সন্ন্যাসীরা জানালেন, ভয়াবহ যকেরা ওই গুপ্তধনের ওপরে পাহারা দেয় দিন-রাত! একবার এক অধার্মিক রাজা গুপ্তধন অধিকার করতে যান। কিন্তু যকেরা এমন উৎপাত শুরু করে। যে রাজা প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আমরাও যতবার গুপ্তধন নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ততবারই ভৌতিক উৎপাত হয়েছে। রাজপুত্ররা অর্থ দিয়েছিলেন মঠের উন্নতির জন্যে। কিন্তু সংস্কারের অভাবে মঠের আজ অতি দুর্দশা হলেও ধনভাণ্ডারে হাত দেওয়ার উপায় নেই। আপনি সাধু ব্যক্তি। আপনার ওপরে হয়তো যকেরা অত্যাচার করবে না।

হুয়েন সাং রাজি হয়ে ধূপ-ধুনো জ্বেলে উপাসনা করে যক্ষদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে যক্ষ, হে গুপ্তধনের রক্ষক! আমার ওপরে প্রসন্ন হও! আমি মন্দির মঠের মেরামতির জন্যে যে অর্থের দরকার কেবল তাই নিয়ে বাকি সব ঐশ্বর্য যথাস্থানে রেখে দেব!

যকেরা হুয়েন সাংকে বাধা দিলে না। গুপ্তধনের অধিকাংশই হয়তো এখনও মাটির তলায় লুকোনো আছে। আমার গল্প ফুরুল।

আমি বললুম, কিন্তু আমাদের গল্প এইবার শুরু হবে।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসু চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, তার মানে?

পরে সব বলছি। আপনার এই ঐতিহাসিক গল্পটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অন্ধকারের মধ্যে একটু-একটু আলো দেখতে পেয়েছি বটে, কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। ধাঁধায় পড়ে আছি এই কাগজখানা নিয়ে। এর রহস্য উদ্ধার করতে পারেন কি? বলেই আমি ধুকধুকির ভেতর থেকে পুরু কাগজখানা বার করে তার হাতে দিলুম।

বিনয়বাবু কাগজখানার ওপরে চোখ বুলিয়েই সহজ স্বরে বললেন, এ তো দেখছি ব্রেল পদ্ধতিতে লেখা!

কুমার লাফিয়ে উঠে বললে, ব্রেল পদ্ধতিতে লেখা? অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে অন্ধেরা লেখাপড়া করে?

হ্যাঁ, এই পদ্ধতিতে এক থেকে ছয়টি মাত্র বিন্দুকে নানাভাবে সাজিয়ে বর্ণমালা প্রভৃতির সমস্ত কাজ সারা যায়। আমি অন্ধ না হলেও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এ-পদ্ধতিটা শিখে নিয়েছি।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, তাহলে লেখাটা আপনি এখনি পড়তে পারবেন?

নিশ্চয়! খুব সহজেই!

কুমার আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠল, জয় বিনয়বাবুর জয়!

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ছুন-ছিউ

আমরা সবাই কৌতূহলী চোখে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

ধুকধুকির ডালা খুলে বাঁ-হাতের ওপরে সেখান রেখে বিনয়বাবু আগে সেই emboss করা বিন্দুগুলোর ওপরে ডান হাতের আঙুল বুলিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, এর ওপরে ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে–শা-লোকা ও পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ ও কুবের মূর্তি ও গুপ্ত গুহা :–ব্যস, আর কিছু নেই!

আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে কথাগুলো মনে-মনে নাড়াচাড়া করে দেখলুম, তারপর বললুম, বিনয়বাবু, আপনার মতে শা-লোকা, কি-পিন, কা-পিন, কপিশ বলতে এক জায়গাকেই বোঝায়?

আমার মত নয় বিমল, এ হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মত।

ওখানে গুপ্তধন আছে, এটাও ঐতিহাসিক সত্য?

একে ঐতিহাসিক সত্য না বলে ঐতিহাসিক গল্প বলা উচিত। এ গল্প বলেছেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং। ঐতিহাসিকরা গল্পটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ এর সত্য মিথ্যার জন্যে ঐতিহাসিকরা দায়ী নন।

তাহলে শা-লোকা বা কপিশ মঠের কথাও গল্পের কথা?

না, কা-পিন, কি-পিন, শা-লোকা বা কপিশ–যে নামেই ডাক, ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে।

উত্তর পূর্ব আফগানিস্থানে

? হ্যাঁ। ও জায়গাটির আধুনিক নাম হচ্ছে কাফ্রিস্থান।

কুমার বললে, কাফ্রিস্থান? ও বাবা, সে যে হিন্দুকুশ পাহাড়ের ওপারে! সেখানেও বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু দেবতা কুবের!

বিনয়বাবু বললেন, কুমার, আজকের দিনে ভারতবাসী পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা পেয়ে নিজেকে সভ্যতায় অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করে বটে, কিন্তু স্বদেশ আর স্বজাতি সম্বন্ধে হয়েছে রীতিমতো অন্ধ। তোমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজরা আফগানিস্থানের এপারেই ভারতের সীমারেখা টেনেছে বলে সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নেওয়ার কারণ নেই। এক সময় ভারত সম্রাটের সাম্রাজ্য যতদুর বিস্তৃত ছিল ইংরেজরা আজও ততদুর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আফগানিস্থান নামে কোন দেশের নাম কেউ তখন স্বপ্নেও শোনেনি। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রিকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুকুশেরও ওপারে। আজ বিলাতি জিওগ্রাফি যাকে আফগানিস্থান বলে ডাকে, তখনকার পৃথিবী তাকে ভারতবর্ষ বলেই জানত, আর সেখানে বাস করত ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনরাই। ওখানে যে বৌদ্ধ মঠ আর হিন্দু দেবতা থাকবে, এ আর আশ্চর্য কথা কি? ভারতের গৌরবের দিনে উত্তরে চিনদেশে, দক্ষিণে জাভা, বালি, সুমাত্রা দ্বীপে আর পূর্বে কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে হিন্দু দেবতাদের যাতায়াত ছিল। তোমরা সত্যিকার ভারতের ইতিহাস পড়ো ভাই, নিজেদের এমন ছোট করে দ্যাখো না!

আমি বললুম উত্তম! তাহলে দু-চার দিনের মধ্যেই আমরা কাফ্রিস্থানে ভারতের পূর্বগৌরব দেখবার জন্যে যাত্রা করব, আর আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন আপনিই!

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তোমাদের এই আকস্মিক উৎসাহ অত্যন্ত সন্দেহজনক!

কেন?

বিমল ভায়া, আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না, আমি তোমাদের খুব ভালো করেই চিনি! ধুকধুকির ওপরে ব্রেল পদ্ধতিতে লেখা এই অদ্ভুত কথাগুলো আর কা-পিন, কি পিন বা কপিশ মঠ সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহ দেখেই বুঝতে পেরেছি, আবার তোমরা নতুন কোনও অ্যাডভেঞ্চার-এর গন্ধ পেয়েছ! আসল ব্যাপারটা কী বলো দেখি?

আমি তখন হাসতে হাসতে চিনে-হোটেলের ঘটনাটা বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে বিমলবাবু হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, বিমল! কুমার! তোমাদের মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কেন?

কণিষ্ক ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ। গুপ্তধনের কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়াও যায়, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য যে, এতকাল পরে সেখানে গিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না।

কারণ?

কারণ, ঐতিহাসিক গল্পেই প্রকাশ, প্রাচীন কালেও ওই গুপ্তধনের কাহিনিটি ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত, তাই আরও অনেকে তা লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতেও হুয়েন সাং স্বচক্ষে সেই গুপ্তধন দেখেছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী বড় কম দিনের কথা নয়।

তারপর কত বিদেশি দস্যু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ঠিক ওই অঞ্চল দিয়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তারা কি ওই গুপ্তধনের কথা শোনেনি?

না শোনাও আশ্চর্য নয়। তারপর ভারতে কতবার অন্ধযুগ এসেছে। বার বার কত রাজ্যের, কত ধর্মের উত্থানপতন হয়েছে। মঠ গেছে ভেঙে, সন্ন্যাসীরা গেছে পালিয়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্যে পড়ে লোকে গুপ্তধনের কথা না ভুললেও ঠিকানা হয়তো ভুলে গিয়েছে।

পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত গুপ্তধনের গল্প শোনা যায়, যার কথা সকলেই জানে কিন্তু যার ঠিকানা কেউ জানে না!

কুমার বললে, তারপর আরও একটা কথা ভেবে দেখুন, বিনয়বাবু! আপনি ইতিহাসের যে গল্পটা বললেন আমরা কেউই তা জানতুম না। কিন্তু সেই হতভাগ্য চিনেম্যানের কাছ থেকে আমরা যে ধুকধুকিটা পেয়েছি, তার সঙ্গে ওই গল্পের প্রধান কথাগুলো অবিকল মিলে যাচ্ছে। যেমন শা-লোকা, ভাঙা মঠ, কুবের মূর্তি। আপনি বলেছেন, শা-লোকা বা কপিশ মঠ ছিল পাহাড়ের উপত্যকায়, ধুকধুকির লেখাতেও রয়েছে গুপ্তগুহার কথা, আর গুহা থাকে পাহাড়েই। তারপর সেই চিনাম্যান মরবার আগে কি-পিন-এরও নাম করেছিল। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, যেমন করেই হোক একালের কেউ-কেউ ওই প্রাচীন ঐতিহাসিক গুপ্তধনেরই ঠিকানা জানতে পেরেছে।

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, না ভায়া, আমি তোমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারব না। তোমরা যতই যুক্তি দেখাও, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটবার বয়স আর আমার নেই। তারপর অত লোভও ভালো নয়। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। আবার গুপ্তধনের উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ছুটাছুটি করা কেন?

বিনয়বাবু আমাদের ভুল বুঝেছেন দেখে আমি আহত স্বরে বললুম, বিনয়বাবু, আপনি তো জানেন, টাকাই আমাদের ধ্যানজ্ঞান নয়! এ-গুপ্তধন হচ্ছে আমাদের ঘর ছেড়ে পথে বেরুবার একটা ওজর বা উপলক্ষ্য মাত্র। গেল জন্মে আমি আর কুমার নিশ্চয়ই বেদুইন ছিলুম শান্ত শ্যামলতার সুখ-স্বপ্নের চেয়ে অশান্ত মরুভূমির বিভীষিকাই আমাদের কাছে লাগে ভালো। দখিন বাতাসের চেয়ে কালবৈশাখীর ঝড়ই আমরা বেশি পছন্দ করি।

এমন সময়ে রামহরি ঘরের ভেতর ঢুকে বললে, খোকাবাবু, চারটে চিনেম্যান এসেছে। এ-বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, চিনেম্যান? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

কুমার চিন্তিত স্বরে বললে, চিনে হোটেলের কর্তারা নয়তো? হয়তো পুলিশ-হাঙ্গামে পড়ে আমাদের সাক্ষী মানতে এসেছে।

আমি বলুলম, অসম্ভব। তারা আমার ঠিকানা জানবে কেমন করে?

কুমার বললে, তাও বটে!

তাই তো, কে এরা? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কলকাতায় ভদ্র-অভদ্র কোনও চিনেমানের সঙ্গেই তো আমার আলাপ-পরিচয় নেই!

রামহরি বললে, কী গো, ওদের কী বলব?

এখানে আসতে বলল।

রামহরি চলে গেল। ধুকধুকিটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে আমি জামার পকেটে রেখে দিলুম।

ঘরের ভেতরে প্রথমেই যে মূর্তিটা এসে দাঁড়াল তাকে দেখেই চিনতে আমার একটুকুও বিলম্ব হল না। কাল রাত্রে হোটেলে এই লোকটাই ছোরা হাতে করে সেই চিনে বুড়োকে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল।

আমি হতভম্বের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একগাল হেসে ইংরেজিতে বললে, কী বাবু, তুমি কি আমাকে চিনে ফেলেছ? হা-হা-হা-হা–আমরা পুরোনো বন্ধু, কী বলো?

আমি রুক্ষস্বরে বললুম, এখানে তোমার কী দরকার?

বলছি। আগে ভালো করে একটু বসি। তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। এবং তার আরও তিনজন সঙ্গীও ঘরের ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল ঠিক তিনটে পাথরের মূর্তির মতো।

কুমার ক্রুদ্ধস্বরে বললে, তোমরা হচ্ছ হত্যাকারী। এখনি পুলিশে খবর দেব।

প্রথম চিনেম্যানটা আবার একগাল হেসে বললে, বেশ বাবু, তাই দিও। কিন্তু এতটা তাড়াতাড়ি কেন? আগে আমার কথাই শোনো।

আমি বসে-বসে লোকটাকে ভালো করে লক্ষ করতে লাগলুম। আগেও দেখেছিলুম এখনও দেখলুম, মাথায় সে পাঁচ ফুট উঁচু হবে না, কিন্তু তার দেহটা চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। অসম্ভব চওড়া দেহের ওপরে মঙ্গোলীয় ছাঁচে গড়া মুখ–আমার সামনে বসে আছে যেন মানুষের ছদ্মবেশে বীভৎস একটা ওরাং-উটান!

সে হাসতে হাসতে বললে, বাবু, হোটেলে কাল তুমি আমার মুখের ওপরে যে ঘুসিটা চালিয়েছিলে, আমি এখনও তা ভুলিনি!

আমি বললুম, ও, সেইজন্যেই কি তুমি আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

মোটেই নয় বাবু, মোটেই নয়! আমি তোমার ঘুসির তারিফ করি!

জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগলুম, লোকটার উদ্দেশ্য কী?

সে বললে, ভগবান আমাকে ঢ্যাঙা করেননি, কিন্তু আমার গায়ে শক্তি দিয়েছেন। এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। একহাতে আমি তিন মণ মাল মাথার ওপরে তুলে ষোলো হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি! কিন্তু আমার মতন লোককেও তুমি এক ঘুসিতে কাবু করেছ! যদিও আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত থাকলে এমন অঘটন ঘটত না, তবু তুমি বাহাদুর!

তোমার নাম কি ছুন-ছিউ?

সে চমকে উঠল। তারপর বললে, তাহলে তুমি আমার নাম পর্যন্ত আদায় করেছ? ভালো কথা নয় ভালো কথা নয় বলতে বলতে ধাঁ করে পকেটের ভেতরে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করলে একটা রিভলভার।

তার পিছনের তিন মূর্তিও সঙ্গে-সঙ্গেই এক-একটা রিভলভার বার করে ফেললে।

আমাদের চোখের সামনে স্থির হয়ে রইল চার-চারটে রিভলভারের চকচকে নলচে!

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। রামহরির ভীমরতি হয়নি

ছুন-ছিউ-র রিভলভারটার লক্ষ ঠিক আমার দিকেই!

এভাবে চোখের সামনে রিভলভার তুললে কারুরই মনে স্বস্তি হয় না, আমারও হল না।

কুমার, বিনয়বাবু ও কমলের মুখের পানে একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলুম। রিভলভারের মহিমায় তাদের কারুরই ভাবান্তর হয়নি দেখে বিস্মিত হলুম না। আমরা সকলেই একই বিপদ পাঠশালার পাঠ গ্রহণ করেছি বহুবার, রিভলভার দেখেই আর্তনাদ করবার অভ্যাস আমাদের নেই।

ঘরের এদিকে- ওদিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমাদের পিছনে ঘরের দেওয়াল। আমার ডানপাশে কুমার, বাঁ-পাশে বিনয়বাবু, তার পাশে কমল বসে আছে। আমার সামনেই একটা গোল মার্বেলের টেবিল। তার ওপাশে বসে ছুন-ছিউ এবং তার পিছনে এক সারে দাঁড়িয়ে আছে আর তিনটে চিনেম্যান। তাদের পিছনেই এ ঘর থেকে বেরুবার একমাত্র দরজা। পিছনে হটবার উপায় নেই, চিনেদের এড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়াও অসম্ভব। নিজের ঘরেই ফঁদে পড়ে গিয়েছি, পালাবার পথ একবারে বন্ধ।

টেবিলের তলায় স্থির হয়ে বসে আছে বাঘা। অন্য কোন কুকুর হলে এতক্ষণে নিশ্চয় গর্জন করে তেড়ে যেত। কিন্তু রিভলভারের সামনে গর্জন করলে বা তেড়ে গেলে যে মহা বিপদের সম্ভাবনা, এটা বুঝতে তার দেরি লাগল না–এমনি শিক্ষিত কুকুর সে!

ছুন-ছিউ হাসতে হাসতে বললে, বাবু কী দেখছ, কী ভাবছ? বুঝতে পারছ তো এ বাড়ির মালিক হচ্ছি এখন আমি?

হতভাগার বাঁদুরে মুখে হাসি দেখে গা যেন জ্বলে গেল। বললুম, ছুন-ছিউ, তোমার রিভলভার নামাও। তুমি ভুলে যাচ্ছ এটা চিনদেশ নয়।

ছুন-ছিউ বললে, না বাবু, ভুলিনি। আমি জানি এটা বাংলাদেশ, আর এখানে বাস করে কাপুরুষ বাঙালিরা।

আমরাও সশস্ত্র হলে একথা বলার সাহস তোমার হত না।

চুপ করো বাবু! তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে আসিনি। কাল হোটেল থেকে তোমরা একটা লকেট চুরি করে এনেছ। ভালো চাও তো সেখানা ফিরিয়ে দাও।

ছুন-ছিউ, তুমি চণ্ডু খেয়ে স্বপ্ন দেখছ। লকেট! সে আবার কী?

আকাশ থেকে খসে পড়বার চেষ্টা কোরো না বাবু! তুমি কি বলতে চাও তোমার কাছে একখানা রূপোর লকেট নেই?

আমার যুক্তি হচ্ছে, চোর ডাকাত খুনেকে ঠকাবার দরকার হলে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। অতএব কোনওরকম দ্বিধা না করে বললুম, না। সোনার বা রূপোর বা পিতলের কোনওরকম লকেট-ফকেটের ধার আমি ধারি না।

কুমার মস্ত একটা হাই তুলে বললে, ওহে ছুন-ছিউ, তোমার ছাতা-পড়া দাঁতগুলো দেখে আমার গা বমি-বমি করছে। তুমি দাঁত বার করে আর না হাসলেই বাধিত হব।

বিনয়বাবু টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলেন।

কমলও কম দুষ্ট নয়। বললে, ছুন-ছিউ, তুমি একটা লক্ষ্ণৌ ঠুংরি শুনবে?

বাঘা যেন নাচারের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সামনের দিকে দুই থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার ওপরে নিজের মুখ স্থাপন করলে কিন্তু তার দৃষ্টি রইল চিনেম্যানদের দিকেই।

ছুন-ছিউ বললে, ওহে বাবু, আমার সঙ্গে রসিকতা করা নিরাপদ নয়। মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি, চোখে দেখবার আগেই আমি মানুষ খুন করে বসি।

আমি বললুম, কিন্তু চোখে দেখেও তুমি দয়া করে আমাদের খুন করছ না কেন শুনি!

লকেটখানা কোথায় রেখেছ এখনও টের পাইনি বলে।

তাহলে লকেটখানা পেলেই তোমরা আমাদের খুন করবে?

না। তোমরা ভদ্র ব্যবহার করো, আমরাও ভদ্র ব্যবহার করব।

ধন্যবাদ। কিন্তু লকেট আমাদের কাছে নেই।

নেই নাকি? কিন্তু হোটেলে কাল তুমি যখন মরোমরো বুড়ো চ্যাংয়ের গলা থেকে লকেটখানা খুলে নিচ্ছিলে, আমাদের লোক তা দেখেছিল। তারপর তোমাদের পিছু ধরে এসে। আমাদের লোক এই বাড়িখানাও দেখে গিয়েছে। বুঝেছ? আমরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে এখানে আসিনি!

ঠিক সেই সময়ে দেখলুম, দরজার বাইরে রামহরির মুখ একবার উঁকি মেরেই সাঁৎ করে সরে গেল! আগেই বলেছি, দরজার দিকে পিছু ফিরে তিনটে চিনেম্যান এক সারে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল ছুন-ছিউ। সুতরাং তারা কেউ এই দৃশ্যটা দেখতে পেলে না।

আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলুম–এবং কুমার ও কমলের মুখ দেখে বুঝলুম, তারাও দেখেছে এই দৃশ্যটা।

বিনয়বাবু হঠাৎ হাতের বইখানা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর গোঁফদাড়ির ফাঁকে একটুখানি হাসির ঝিলিক ফুটেই মিলিয়ে গেল। হুঁ, বিনয়বাবু তাহলে বই পড়তে-পড়তে চোরা চোখে তাকাতে পারেন।

বাঘা টপ করে উঠে পড়ে একটা ডন দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং ঘন-ঘন নাড়তে লাগল তার ল্যাজটা।

ছুন-ছিউ আশ্চর্য হয়ে বললে, আরে, আরে, কুকুরটা খামোকা দাঁড়িয়ে উঠে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে কেন?

আমি বললুম, এতক্ষণ পরে ও তোমাকে বন্ধু বলে চিনে ফেলেছে।

ছুন-ছিউ চট করে একবার পিছনদিকটা দেখে নিয়ে বললে, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি! না, আর দেরি নয়! হয় লকেট দাও, নয় মরো! সে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে দুই পা এগিয়ে এল।

কুমার বললে, অতটা এগিয়ে এস না ছুন-ছিউ, অতটা এগিয়ে এস না! তাহলে আমি খপ করে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারি!

ছুন-ছিউ আবার পিছিয়ে পড়ে বললে, কেড়ে নিবি? দানব-মানব, ভগবান-শয়তান– ছুন-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে? ওরে, এই বাঙালি-বাবুদের কেউ একটা আঙুল নাড়লেই তোরা গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দিবি, বুঝেছিস?

তারা চারজনে আমাদের এক-একজনের দিকে লক্ষ স্থির করে রিভলভার তুলে ধরলে।

এইবারে সত্য-সত্যই ছুন-ছিউর দুই চক্ষে ফুটে উঠল হত্যাকারীর জ্বলন্ত দৃষ্টি! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বললে, এই আমি তিন গুণছি। এরমধ্যে লকেট না দিলে আর তোদের রক্ষে নেই!..এক..দুই।

ছুন-ছিউ দুই গোনবার সঙ্গে-সঙ্গে দ্বারপথে আবার রামহরির আবির্ভাব। পা টিপে টিপে সে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল-এক গাছা লম্বা, মোটা দড়ির দুই মুখ দুই হাতে ধরে! তারপর সে গাছাকে স্কিপিং দড়ির মতন শূন্যে তুলেই সে একসঙ্গে তিন চিনে-মুর্তির মাথার ওপর দিয়ে ফেলে খুব জোরে মারলে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান! বয়সে রামহরি পঞ্চান্ন পার হলেও এখনও সে শক্তিহীন হয়নি-পরমুহূর্তেই তিন চিনেমূর্তি একসঙ্গে ঠিকরে প্রপাত ধরণীতলে! বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার ও কমলও সেই মুহূর্তেই এক-এক লাফে সেই ভূপতিত দেহ তিনটের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

এদিকে শব্দ শুনে চমকে ছুন-ছিউ যেই ভুলে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি বাঘা তড়াক করে লাফ মেরে তার রিভলভারশুদু ডান হাতের কবজিতে কামড় মেরে ঝুলে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ধাক্কা মেরে সামনের টেবিলটা সরিয়ে ছুন-ছিউর চোয়ালের ওপরে দিলুম বিষম এক নক-আউট ব্লো! হঠাৎ গোড়াকাটা গাছের মতো ছুনছিউ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মেঝের ওপরে!

সমস্ত ব্যাপারটা বলতে এতগুলো লাইনের দরকার হল বটে, কিন্তু এগুলো ঘটতে এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি!

হাতে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা পরে চোয়ালের ঠিক জায়গায় ঘুসি মারতে পারলে প্রতিপক্ষ তখনি কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বেই পড়বে! কিন্তু দস্তানাহীন হাতে চোয়ালের যথাস্থানে ঘুসি মারলেও প্রায়ই দেখা যায়, চোয়াল ভেঙে রক্তাক্ত হয়ে গেলেও এবং কাবু হয়ে পড়লেও প্রতিপক্ষ জ্ঞান হারায়নি!

ছুন-ছিউও জ্ঞান হারাল না। মাটিতে পড়েই সে আবার ওঠবার উপক্রম করছে দেখে আমি তারই হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা তুলে নিয়ে ধমক দিয়ে বললুম, চুপ করে শুয়ে থাক চিনে-বাঁদর! নড়লেই মরবি-তোকে মারলে আমার ফাঁসি হবে না!

আচ্ছন্ন হতভম্বের মতো আমার হাতের রিভলভারের দিকে তাকিয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

ফিরে দেখি, বিনয়বাবু, কুমার ও কমলেরও হাতে গিয়ে উঠেছে তিন চিনেম্যানের তিন রিভলভার! রামহরি আনন্দে আটখানা হয়ে হাততালি দিচ্ছে এবং বাঘা ঘেউ-ঘেউ রবে ঘরময় ছুটে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে!

বললুম, রামহরি, নিয়ে এসো আরও খানিকটা দড়ি! এই চার বেটার হাত-পা বেঁধে ফ্যালো!

রামহরি তখন আরও দড়ি নিয়ে এসে চিনেম্যানগুলোকে বাঁধতে বসল।

কুমার বললে, একেই ইংরেজিতে বলে টেবিল উলটান! চিনেদের হলদে হাতের রিভলভারগুলোই এসেছে এখন আমাদের বাদামি হাতে।

কমল বললে, দানব-মানব, ভগবান-শয়তান–ছুন-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?–কেড়ে নেবে আমাদের প্রিয়তম বাঘা! দানব-মানব, ভগবান-শয়তানের যা অসাধ্য কুকুর বাঘার এক কামড়ে তা সাধ্য হল!

ছুন-ছিউ রাগে ফুলতে-ফুলতে বললে, তোমরা এখন আমাদের নিয়ে কী করতে চাও?

আমি বলুলম, রামহরি, ও ঘরে গিয়ে থানায় ফোন করে দিয়ে এসো তো!

রামহরি বললে, খোকাবাবু, তুমি আমাকে মনে করো কী? বুড়ো হলেও এখনও ভীমরতি হয়নি–আর লেখাপড়া না জানলেও বুদ্ধিতে আমি তোমাদের কারুর চেয়ে কম নই! এই চার চিনে হনুমানের রকমসকম উঁকি মেরে দেখেই আমি খানিক আগে থানায় ফোন করে দিয়েছি– পুলিশ এসে পড়ল বলে!

বিনয়বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, ধন্য রামহরি, ধন্য! আজকের এই নাট্যাভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় তোমার কৃতিত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । রাতের আঁধারে

এইবারে বিনয়বাবুকে রাজি করিয়েছি।

তার কাফ্রিস্থানে যেতে নারাজ হওয়ার প্রধান কারণই ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধমঠের মধ্যে এখনও যে গুপ্তধন আছে এটা তিনি সত্য বলে মানতে পারছিলেন না। কিন্তু চিনেম্যানগুলোর কাণ্ড দেখে এখন তিনি মত বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন, গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত না হলে ওই চিনে দুরাত্মার দল এত মরিয়া হয়ে এমন সব সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে পারত না।

এখন তিনি বলছেন, ওহে, ওই লকেটের পিছনে সত্যই কোন গুপ্তরহস্য আছে! গুপ্তধনের। লোভ আমি করি না, কিন্তু রহস্যটা কী জানবার জন্যে ভারী আগ্রহ হচ্ছে।

আগ্রহ নেই খালি রামহরির। সে থেকে থেকে বলে, ছি-ছি! বিনয়বাবু, এই বয়েসে কোথায় জপ-তপ আর হরিনাম নিয়ে থাকবেন, তা না করে আপনিও কিনা ওই গোঁয়ার ছোঁড়াগুলোর দলে গিয়ে ভিড়লেন।

বিনয়বাবু যুৎসই জবাব খুঁজে না পেয়ে অসহায়ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

কুমার বলে, ভাংচি দিওনা রামহরি, দল ভাঙাবার চেষ্টা কোরো না। তোমার যদি এতই অমত, তবে থাক না তুমি কলকাতায় পড়ে। আমরা তো মাথার দিব্যি দিয়ে তোমাকে সাধাসাধি করছি না? কী বলিস রে বাঘা?

বাঘা বোধ করি সায় দেওয়ার জন্যেই একবার কুমার আর একবার রামহরির মুখের পানে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

আরে সমালো, পাজি কুকুর! তুইও ওই দলে? রামহরি রেগে চড় মারতে যায়, বাঘা কুমারের পিছনে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

আমাদের যাত্রার তোড়জোড় চলছে। এতদিনে আমরা বেরিয়েও পড়তুম, কিন্তু যেতে পারছি না কেবল ওই হতভাগা ছুনছিউয়ের জন্যে। এখনও তার বিচার শেষ হয়নি, আর আমরা হচ্ছি সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী।

পুলিশের তদারকে প্রকাশ পেয়েছে, ছুন-ছিউ হচ্ছে চিনদেশের এক বিখ্যাত ডাকাতসর্দার, তার দলের লোক অনেক। সে যে কবে চিন থেকে ভারতে হাজির হয়েছে এবং তার এই আসার উদ্দেশ্যই বা কী, পুলিশ এখনও তা জানতে পারেনি।

কিন্তু আমরা আন্দাজ করছি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গুপ্তধন।

পুলিশ আর একটা তথ্য সংগ্রহ করেছে। হোটেলে যে বুড়ো চিনেম্যানটা খুন হয়েছে, সেও নাকি আগে ছুন-ছিউর দলে ছিল। বোধহয় লকেটটা কোন রকমে হাতিয়ে সে দল ছেড়ে সরে পড়ে এবং তারপর ভারতে আসে। তাকে অনুসরণ করে এসেছে ছুন-ছিউ আর তার দলবল।

আমরা স্থির করেছি, ছুন-ছিউ যদি প্রকাশ না করে, তাহলে আমরাও আদালতে লকেটের কথা জাহির করব না।

এখন পর্যন্ত ছুন-ছিউ হাটে হাঁড়ি ভাঙেনি। কেবল এইটুকুই বলেছে, ওই লকেটখানা সে এত পবিত্র বলে মনে করে যে, ওর জন্যে একশোটা নরহত্যা করতেও তার আপত্তি নেই।

কিন্তু আমরা পুলিশের কাছে লকেটের কথা অস্বীকার করেছি। বলেছি, আমরা লকেট ফকেটের ধার ধারি নাছুন-ছিউ ভুল সন্দেহ করেছে।

তার এই লুকোচুরির মানে বোঝা যায়। ফাঁসিকাঠের ছায়ায় দাঁড়িয়েও সে আজ পর্যন্ত লকেটের আশা ছাড়তে পারেনি। তার বিশ্বাস, লকেটের লেখা ও তার মর্ম এখনও কারুর কাছে ধরা পড়েনি।

বিচার যেভাবে চলছে তাতে বেশ বলা যায় যে ছুন-ছিউর প্রাণদণ্ডই হবে।

এদিকে আমাদের থাকতে হয়েছে অতি সাবধানে। অনুমান করতে পেরেছি, ছুন-ছিউ হাজতে বাস করছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকেরা আমাদের ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভোলেনি। কেননা আমাদের এ পাড়ায় আজকাল চিনেম্যানদের আনাগোনা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। কেউ খেলনা, কেউ চেয়ার, কেউ কাপড়ের বস্তা বেচতে এসে আমার বাড়ির কড়া নাড়তে থাকে, কিছু কিনব না বললেও সহজে নড়তে চায় না। একদিন একটা চিনেজোঁক চিনেম্যানকে তাড়াবার জন্যে বাঘাকে লেলিয়েও দিতে হয়েছিল! এইসব শুনে পুলিশ আমার বাড়ির দরজায় একজন পাহারাওয়ালা রাখবার ব্যবস্থা করেছে।

হঠাৎ বিনয়বাবু একদিন এলেন অদ্ভুত একটা সংবাদ নিয়ে।

উত্তেজিত মুখে ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, ও হে, আজকের কাগজ পড়েছ?

না।

ছুন-ছিউ হাজত থেকে পালিয়েছে!

বিস্মিত হয়ে বললুম, সে কী! কেমন করে?

কাল আদালত থেকে তাকে হাজতে পাঠাবার জন্যে যখন নীচে নামিয়ে আনা হচ্ছিল, তখন হঠাৎ সে চেষ্টা দৌড় মারে। প্রহরীরা পিছনে তাড়া করে। পথে অপেক্ষা করছিল খুব দ্রুতগামী একখানা বড় মোটর। সে লাফ মেরে তার ওপরে গিয়ে ওঠে, আর গাড়িখানা যেন হাওয়ার আগে উড়ে চলে যায়। পুলিশ তখন অন্য গাড়িতে উঠে পিছনে অনুসরণ করে। খানিকক্ষণ এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ছোটাছুটির পর ছুন-ছিউর গাড়িখানা ধরা পড়ে। তার মধ্যে দুটো চিনেম্যান ছিল, কিন্তু ছুন-ছিউ ছিল না। সে কোন ফাঁকে কোথায় নেমে পড়ে পুলিশের চোখে বেমালুম ধুলো দিয়েছে!

কুমার বললে, এ তো ভারী বিপদের কথা!

বিনয়বাবু বললেন, বিপদ? হুঁ, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ছুন-ছিউ হয়তো আবার লকেট উদ্ধারের চেষ্টা করবে। সাবধান বিমল, সাবধান!

আমি বললুম, ছুন-ছিউর সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার সুযোগ হবে, এটাও আমি অনুমান করতে পারছি।

বিনয়বাবু বললেন, লকেটখানা পুলিশের হাতে সমর্পণ করো, সব ঝাট চুকে যাক।

লকেটের কথা অস্বীকার করবার পর আর তা করা চলে না। আমাদের সামনে এখন। খোলা আছে একমাত্র পথ।

কী পথ?

কাফ্রিস্থানে যাত্রা করবার পথ। ছুন-ছিউকে আমরা প্রস্তুত হওয়ার অবসর দেব না। কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ছুন-ছিউ এসে দেখবে, খাঁচা খালি, পাখি নেই।

কুমার উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, ঠিক, ঠিক! উত্তম প্রস্তাব।

বিনয়বাবু বললেন, যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বটে। কিন্তু তুমি কি মনে করো বিমল, ছুন ছিউ আমাদের সঙ্গ নিতে পারবে না?

জবাব দিতে যাবহঠাৎ ঝনঝন করে জানলায় একখানা শার্সি ভেঙে গেল এবং ঘরের মেঝের ওপর সশব্দে এসে পড়ল একখণ্ড পাথর, তার সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা একখানা কাগজ।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি, কুমার ছুটে গিয়ে কাগজশুদ্ধ পাথরখানা কুড়িয়ে নিল। তারপর কাগজখানার দিকে চেয়েই বলে উঠল, বন্ধুবর, ছুন-ছিউর চিঠি। ইংরেজিতে লেখা।

এখনও লকেট ফিরিয়ে দাও। নইলে মৃত্যু অনিবার্য!-ছুন-ছি।

কুমার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে বললে, না রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। পাহারাওলা বললে, এখানে সে কোনও চিনেম্যানকে দেখেনি।

আমি বললুম, ছুন-ছিউ এরই মধ্যে আবার জাল ফেলেছে! বেশ আমরাও অপ্রস্তুত নই। কালই আমাদের যাত্রার দিন।

রামহরি নিশ্চয় ঘরের বাহির থেকে সমস্ত শুনছিল। সে চিৎকার করে উঠল, হে মা কালী! হে মা দুর্গে! ও বাবা মহাদেব! খোকাবাবুর দিকে কৃপা কটাক্ষে একটু নিরীক্ষণ কোরো!

বোধ হয় রামহরির বিশ্বাস, খুব জোরে চেঁচিয়ে না ডাকলে সুদুর স্বর্গের দেবদেবীরা মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান না!

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আয়োজন করতে করতে কেটে গেল। এর মধ্যে শত্রুপক্ষ আর কোনও সজাগতার লক্ষণ প্রকাশ করেনি। এমনকী পথের চিনে-জনতা পর্যন্ত একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বিনয়বাবু বললেন, এ হচ্ছে ঝড়ের আগেকার শান্তি!

কমল বললে, ঝড় উঠলেই বজ্রনাদ করবার জন্যে আমাদের বন্দুকগুলো তৈরি আছে!

বিনয়বাবু বললে, থামো ফাজিল ছোকরা! একফোঁটা মুখে অত বড়-বড় বুলি ভালো শোনায় না।

সন্ধ্যার সময় স্টেশনে যাত্রা করা গেল। আমরা ফার্স্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করেছি। মেল ট্রেন। পথে বা স্টেশনে একবারও সন্দেহ হল না যে, আমাদের গতিবিধি কেউ লক্ষ করেছে। স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে একখানাও মঙ্গোলীয় ছাঁচের হলদে মুখ নজরে ঠেকল না। গাড়ির প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে এসেছি। কোথাও সন্দেহজনক কিছুই নেই। আপাতত ছুন। ছিউকে ফাঁকি দিতে পেরেছি ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘণ্টা দিলে। ট্রেন ছাড়ল।

কুমার বললে, অজানার অভিমুখে আবার হল অভিযান শুরু! সুদূরের যাত্রী আমরা, অদৃষ্ট আমাদের জন্যে আবার কী নতুন উত্তেজনা সঞ্চয় করে রেখেছে, মনে-মনে সেইটেই আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি।

কমল আইসক্রিম চুষতে চুষতে বললে, এবারে আমরা অদৃষ্টের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করব!

বিনয়বাবু কটমট করে তার দিকে তাকালেন।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে গল্প করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম। জেগে রইল কেবল রামহরি। রেলগাড়িতে তার ঘুম হয় না।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, আচম্বিতে জেগে উঠেই অনুভব করলুম বিষম এক বেদনা। তারপরেই বুঝলুম, বিছানার ওপর থেকে ছিটকে নীচে পড়ে গিয়েছি।

রামহরি, কুমার, কমল ও বিনয়বাবুর দেহও নীচে পড়ে ছটফট করছে এবং বাঘা করছে প্রাণপণে চিৎকার!

হতভম্বের মতো উঠে বসেই আর এক সত্য উপলব্ধি করলুম। ট্রেন চলছে না-ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাইরের দৃশ্য বিলুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম বহুলোকের চিৎকার।

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন-অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্ট!

রামহরি চাঁচাল, হে মা কালী, হে বাবা মহাদেব!

কুমার বললে, বিমল, বিমল, তোমার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে।

আমি তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, ঝুপ-ঝাঁপ করে বৃষ্টি পড়ছে এবং গাড়ি যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই আবছায়ার মধ্যে দেখা যায় একটা উঁচু পাহাড়।

দূরে গাড়ির বাইরে ছুটোছুটি করছে কতকগুলো আলো-গোলমাল আসছে সেইদিক থেকেই।

তারপরেই কামরার পর কামরার দরজাগুলো দুমদাম করে খুলে রেলপথের ওপরে নেমে পড়তে লাগল দলে দলে যাত্রী!

ব্যাপার কী?

.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । বিপদগ্রস্ত পৈতৃক প্রাণ

এই অস্থানে কেন হঠাৎ গাড়ি থামল? আলো নিয়ে জলে ভিজেই বা অত লোক কেন ছুটোছুটি করছে?

পৃথিবীকে সশব্দ করে অন্ধকার আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছিল হুড়হুড় এবং কামরার জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়া আলোকরেখার মধ্যে এসে সেই ঝরা জল উঠছিল চকচক করে। কিন্তু দেখতে-দেখতে বৃষ্টির তোড় এল কমে।

আমি তাড়াতাড়ি বর্ষাতি বার করে পরতে লাগলুম।

বিনয়বাবু শুধোলেন, বিমল, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ?

হ্যাঁ, আপনারাও আসুন। কামরায় কেবল রামহরি থাক। বলেই আমি রিভলভারটাও বার করে পকেটের ভেতরে রাখলুম।

ও কি, ওটা নিয়ে আবার কী হবে?

সাবধানের মার নেই।

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, বাঘা আমাদের সাজগোছ দেখে কীরকম উত্তেজিত হয়েছে দ্যাখো! ওকেও সঙ্গে নেব নাকি?

নিতে চাও, নাও।

সবাই সশস্ত্র হয়ে কামরা ছেড়ে বাইরে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন ট্রেনের প্রত্যেক কামরা থেকে ভীত যাত্রীরা বেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড জনতা সৃষ্টি করেছে। ট্রেনের অনেক কামরার ভেতর থেকে আর্তনাদ ও শিশুদের কান্নাও শোনা যাচ্ছে; অত্যন্ত আচমকা ট্রেনের গতি রুদ্ধ হওয়াতে হয়তো বহু লোক চোট খেয়েছে অল্পবিস্তর।

দূরের আলোকগুলো লক্ষ করে ভিড় ঠেলে আমরা দ্রুতপদে এগুতে লাগলুম। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম ট্রেনের ড্রাইভার, গার্ড ও আরও কয়েকজন কর্মচারী রেললাইনের ওপরে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কী পরীক্ষা করছে।

সেই সময়ে এক সাহেব যাত্রী এসে প্রশ্ন করাতে গার্ড বললে, কারা এখানে গাড়ি উলটে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই দেখুন, লাইনের দুখানা রেল একেবারে খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে! ভাগ্যে ড্রাইভার সতর্ক ছিল, তাই ব্রেক কষে কোনওরকমে শেষ মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে ফেলতে পেরেছে!

রেলপথের দিকে তাকিয়ে দেখে গা শিউরে উঠল! ট্রেন থেমে পড়েছে লাইনের ভাঙা অংশের মাত্র হাত কয়েক আগে! চালক যদি দেখতে না পেত বা একটু অন্যমনস্ক থাকত, তাহলে এই শত-শত পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুতে পরিপূর্ণ দ্রুতগামী মেল ট্রেনের অবস্থা যে কী ভয়ানক হত, সেটা ভাবলেও স্তম্ভিত হয়ে যায় বুক!

অনেকে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে গিয়ে সাদরে ড্রাইভারের করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে ধন্যবাদের পাত্র! তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ না হলে এতক্ষণে হয়তো আমাদের সমস্ত সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে যেত মাটির পৃথিবীর সঙ্গে। বেঁচে থাকলেও হয়তো হাত বা পা হারিয়ে চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে দিন কাটাতুম–মৃত্যুর চেয়ে সে অবস্থা ভয়ংকর।

কুমার বললে, বিমল এ কাজ কার? এর মধ্যে ছুন-ছিউর হাত নেই তো?

গোলমালে ছুন-ছিউর কথা ভুলে গিয়েছিলুম, কুমারের মুখে তার নাম শোনাবামাত্র আমার সারা মন চমকে উঠল।

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, না, না, অসম্ভব!

কুমার বললে, অসম্ভব কেন? সে যে আমাদের ভোলেনি, গেল কালই তার প্রমাণ পেয়েছি! কে বলতে পারে, আমাদের গতিবিধির ওপরে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেনি? হয়তো কাল যখন আমরা গাড়ি রিজার্ভ করতে স্টেশনে এসেছিলুম, তখনও তার চর ছিল আমাদের পিছনে পিছনে। টিকিটঘর থেকেই আমাদের গন্তব্যস্থানের খোঁজ নেওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো ছুন-ছিউ ভেবেছিল, ট্রেন দুর্ঘটনায় গাড়িশুদ্ধ নোক যখন হত বা আহত হবে, চারিদিকে যখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে, তখন সে সদলবলে সেই গোলে-হরিবোলে এসে আবার লকেটখানা উদ্ধার করবে!

বিনয়বাবু বললেন, তোমার আজগুবি কল্পনাকে সংযত করো! তুচ্ছ একখানা লকেটের লোভে ছুন-ছিউর এতখানি বুকের পাটা কিছুতেই হতে পারে না।

কেন হতে পারে না? ছুন-ছিউ কত বড় গোঁয়ার, ভেবে দেখুন দেখি! কলকাতার জনতায় ভরা হোটেলে মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপে না, কলকাতার মতো শহরে দিনের বেলায় আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে সে পিছপা হয়নি, কলকাতার পুলিশ-কোর্ট থেকে

সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সে লম্বা দিয়েছিল–এমন সব দুঃসাহসের কাহিনি আর কখনও শুনেছেন? অদ্ভুত এই চিনে দস্যু! আমার বিশ্বাস সে সব করতে পারে!

আমি এ তর্কে যোগ দিলুম না। আমি তখন ভাবছিলুম, ঘটনাস্থলে অদৃশ্য অপরাধী কোনও চিহ্ন রেখে গেছে কি না? বিজলিমশালের আলো ফেলে রেলপথটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। সেখানে পাথর-ভাঙা নুড়িগুলোর ওপরে কোনও চিহ্নই নেই! উঁচু বাঁধের ঢালু গায়ে রয়েছে ঘাসের আগাছার আবরণ। সেখানেও কিছু পেলাম না। আঁধার রাত্রি তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি বর্ষণ করছিল বাঁধের তলায় দেখলুম কর্দমাক্ত জমি। অপরাধীরা নিশ্চয়ই পাখি হয়ে উড়ে পালায়নি। বাঁধের এপাশে কি ওপাশে মাটির ওপরে তাদের কোনও চিহ্নই কি পাওয়া যাবে না? ভাবতে ভাবতে নীচে নামতে লাগলুম। বাঘা আমার অনুসরণ করলে। এরকম কাজ পেলে সে ভারী খুশি হয়, ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সেইটেই বোধ করি আমাকে জানিয়ে দিতে চাইলে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন, ওকী হে, ওদিকে কোথায় নামছ? শেষটা সাপের কামড়ে মারা পড়বে?

কোনও জবাব দিলুম না। একেবারে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, গোঁ-গোঁ করে ঝড় ডাকছে, অন্ধকার কুঁড়ে দূর অরণ্যের কোলাহল ভেসে আসছে! অদৃশ্য কালো মেঘকে দৃশ্যমান করে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে মাঝে-মাঝে। খানিক তফাতে আঁধারপটে আরও আঁধার রং দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা ছোট বন, নীচের দিকে কালি-মাখা ঝোপঝাপ, ওপর দিকে টলোমলো গাছ–যেন কতকগুলো শিকলে বাঁধা দানব মুক্তিলাভের চেষ্টায় ছটফট করছে।

বাঁধের তলাতেই পেলুম আমি যা খুঁজছিলাম! কুমারকে ডাকতেই সে ছুটে নেমে এল।

সে বললে, এ যে অনেকগুলো লোকের পায়ের দাগ! দাগ দেখে মনে হচ্ছে লোকগুলো মাঠের দিকে গিয়েছে!

বাঘা গম্ভীরভাবে সশব্দে মাটি শুঁকতে লাগল! তারপর চাপা গলায় গর্জন করে বোধ করি পলাতক শত্রুদেরই ধমক দিলে।

বাঁধের ওপর থেকে কৌতূহলী গার্ডও নেমে এসে বললে, বাবু, তোমরা কী করছ?

আমি অঙ্গুলিনির্দেশে মাটির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

গার্ড খানিকক্ষণ নীরবে দাগগুলো পরীক্ষা করে বললে, দেখছি টাটকা পায়ের দাগ!

বললুম, হ্যাঁ, এদের বয়স বেশিক্ষণ নয়। সেইজন্যেই মনে হচ্ছে এই দাগগুলো অপরাধীদেরই পায়ের। কারণ, এমন দুর্যোগে এতগুলো লোক নিশ্চয়ই এখানে ফুর্তি করে হাওয়া খেতে আসেনি।

গার্ড বললে, বাবু, ওই কুকুরটা মাটির ওপরে কী শুঁকতে-শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে।

পায়ের চিহ্নর ভেতরে ও শত্রুদের গন্ধ আবিষ্কার করেছে।

গার্ড বিস্মিতস্বরে বললে, ওটা তো দেখছি, দেশি কুকুর, ও আবার পায়ের দাগের কী মর্ম বুঝবে?

কুমার বললে, যত্ন আর শিক্ষা পেলে আমাদের দেশি কুকুর তোমাদের বিলিতি হাউন্ডের চেয়ে কম কাজ করে না। বাঘা শত্রুদের গন্ধ চেনে।

বাঘার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও রেলপথের তারের বেড়া পার হয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমাদের পিছনে-পিছনে আসতে লাগল আরও অনেক কৌতূহলী লোক–তাদের ভেতরে সাহেব আছে, বাঙালি আছে, হিন্দুস্থানি আছে।

খানিক পরে একটা ঝোপ। গার্ডকে ডেকে বললুম, এইবারে দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।

কী দেখব?

খানিক আগে মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছিল বলে পায়ের ছাঁচগুলো ছিল জলে ভরতি! কিন্তু এখানকার পায়ের ছাঁচ ভিজে হলেও জলে ভরতি নয়।

তাতে কী বোঝায়?

এই বোঝায় যে অপরাধীরা একটু আগেই ঝোপের আড়ালে ছিল দাঁড়িয়ে। বোধ হয়। অপেক্ষা করছিল ট্রেনখানা ওলটাবার জন্যে। কিন্তু ট্রেন রক্ষা পেয়েছে আর আমরা আসছি দেখে তারা চটপট সরে পড়েছে।

বাবু, তোমার যুক্তি বুঝলুম না।

মুশলধারার পর যখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয় অপরাধীরা তখনই এখান থেকে পালিয়েছে। তাই এখান থেকে যেসব পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে তাদের ভেতরটা এখনও জলে পূর্ণ হওয়ার সময় পায়নি।

গার্ড বললে বাবু, তুমি কি পুলিশে কাজ করো?

না।

তবে তুমি এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পেলে কেমন করে?

ভগবান দিয়েছেন বলে। ভগবান সবাইকে চক্ষু দেন বটে, কিন্তু সকলকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন না।

গার্ড বললে, ঠিক বাবু, তোমার কথা আমি স্বীকার করি। পায়ের দাগগুলো আমিও দেখেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি। অথচ এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটুকু আমার অনায়াসেই বোঝা উচিত ছিল। বাবু, তুমি আর কিছু বুঝতে পেরেছ?

এখান থেকে প্রায় দুশো গজ তফাতে একটা জঙ্গলের আবছায়া দেখা যাচ্ছে। পায়ের দাগগুলো ওইদিকেই গিয়েছে। অপরাধীরা নিশ্চয় ওই জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে আছে।

কুমার বললে, এখন আমরা কী করব? ওইদিকে যাব?

গার্ড বললে, না, এখন আমাদের ফিরতে হবে।

কেন?

আমার ওপরে রয়েছে অপরাধী গ্রেপ্তার করার চেয়েও বড় কর্তব্যের ভার। রেললাইন ভেঙেছে, এই খবর দেওয়ার জন্যে আমাকে এখন গাড়ি নিয়ে পিছনের স্টেশনে ফিরে যেতে হবে। নইলে কোনও ডাউন-ট্রেন এসে পড়লে বিষম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, আর সেজন্যে দায়ী হব আমিই।

গার্ডের কথা সত্য। তার ওপরে আমরা ঠিক প্রস্তুত হয়েও আসিনি, সঙ্গে যে লোকেরা রয়েছে তারা হয়তো এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ওই অচেনা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে ভরসা করবে না। আর এমন রাতে অপরাধীদের খুঁজতে যাওয়াও হবে হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে এলোমেলো ছুটোছুটি করার মতো। খুব সম্ভব তাদের খুঁজে পাব না, আর খুঁজে পেলেও ছুন-ছিউ ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করা বড় চারটি খানিক কথা নয়! হয়তো তারা দলে ভারী আর সশস্ত্র।

বিনয়বাবু বললেন, ওহে বাপু বিমল! চুপ করে ভাবছ কী? গোঁয়ারতুমি করবার ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

আমি হেসে বললুম, মোটেই নয়! গার্ড-সাহেবের পিছু পিছু আমি পলায়ন করতে চাই!

কুমার বললে, যঃ পলায়তি স জীবতি! সেকালে কোন বুদ্ধিমান বাঙালিও বলে গেছেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমরা হচ্ছি পিতৃভক্ত পুত্র, বাপের নাম করবার সুযোগ পাব বলেই পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা করা দরকার।

আমি বললুম, কিন্তু কুমার, বাঘা বোধহয় পশু বলেই পৈতৃক প্রাণের মর্যাদা বোঝে না। ওই দ্যাখো, সে আবার বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

বাঘা খালি এগুচ্ছে না, উচ্চস্বরে ঘেউ-ঘেউ চিৎকারও করছে। তার ওরকম চিৎকারের অর্থ আমরা বুঝি। মানুষের পক্ষে অসাধারণ বাঘার পশুদৃষ্টি তিমির-যবনিকা ভেদ করে নিশ্চয়ই কোন শত্রু আবিষ্কার করেছে।

বাঘা ফিরতে রাজি নয় দেখে কুমার দৌড়ে গিয়ে তার বকলস চেপে ধরলে। কিন্তু তবু সে বাগ মানতে চাইলে না বারবার জঙ্গলের দিকে ফিরে ফিরে দেখে আর কুমারের হাত ছাড়াবার জন্যে টানাহ্যাঁচড়া করে। তার ক্রুদ্ধ চোখদুটো জ্বলছে আগুনের ভাটার মতো।

ওদিকে তাকিয়ে আমি কিন্তু খালি দেখলুম, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বাহু আকাশে আন্দোলিত করে জঙ্গলে করছে মর্মর-হাহাকার। তবে এ সন্দেহটা বারংবারই মনের মধ্যে জাগতে লাগল যে, ওই অন্ধকার কেল্লার ভেতরে যারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা একটুও অচেতন নয়-ঝোপঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়ে আছে তাদের হিংস্র চক্ষুগুলো।

গার্ড বললে, আর দেরি নয়, সবাই ফিরে চল!

কমল আপশোশ করে বললে, হায় রে হায়, একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার একেবারেই মাঠে মারা গেল!

খাপ্পা হয়ে বিনয়বাবু বললেন, চুপ, চুপ! একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ!

হঠাৎ বাঘা জঙ্গলের দিকে চেয়ে একেবারে যেন হন্যে হয়ে চেঁচিয়ে উঠল-কুমার আর তাকে ধরে রাখতে পারে না!

গার্ড আশ্চর্য হয়ে বললে, কুকুরটা হঠাৎ এমন করছে কেন?

তার প্রশ্নের উত্তর এল জঙ্গলের দিক থেকে। আচম্বিতে অন্ধকার রাত্রিকে কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম করে দুইবার বন্দুকের আওয়াজ হল-চোখের ওপরে জ্বলেই নিবে গেল দুটো বিদ্যুতের চমক!

যে কৌতূহলী যাত্রীগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল, তারা সভয়ে প্রাণপণে দৌড় মারলে রেলপথের দিকে, আমাদের চারজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল খালি গার্ড ও একজন সাহেব।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, ওই ঝোপের আড়ালে চল-ঝোপের আড়ালে চল!

ঝোপের পাশে গিয়ে গার্ড উত্তেজিত হয়ে বললে, বাবু, বাবু, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়?

কুমার বললে, করতে চায় কি, আক্রমণ করেছে। ওই দ্যাখো, জঙ্গলের দিক থেকে কতগুলো সাদা কাপড় পরা মূর্তি ছুটে আসছে!

আমি রিভলভার বার করে বললুম, দেখছেন বিনয়বাবু, সঙ্গে কেন যন্ত্র আনতে বলেছিলুম?

কুমার হাসতে-হাসতে বললে, ভাই বিমল, আমাদের পৈতৃক প্রাণগুলো এ যাত্রা শনির দৃষ্টি বুঝি আর এড়াতে পারলে না।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ । রামহরির ধূলিশয্যা

একটা ঝোড়ো দমকা হাওয়া আচমকা জেগে হুঙ্কার দিয়ে উঠলসঙ্গে-সঙ্গে টলোমলো গাছপালাগুলো কেঁদে উঠল আরও বেশি উচ্চস্বরে। তারপরেই আবার এল কেঁপে বৃষ্টি। গড়গড় গড়গড় বাজের ধমক-চকমক ঝকমক বিদ্যুৎ চমক!

একে মেঘে কাজলমাখা রাতের অন্ধকার, তার ওপরে সেই ঘন বৃষ্টিধারার পরদা। চোখ আর এদের ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারল না। শত্রুরাও নিশ্চয় এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

যে সাহেবটা শত্রুদের বন্দুকের ভয়ে পালায়নি সে বললে, বাবু, এখন আমাদের কর্তব্য কী?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কি নিরস্ত্র?

না, আমার কাছে রিভলভার আছে।

তাহলে এই ঝোপের আড়ালে আমাদের মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো। শত্রুদের আমাদের রিভলভারের নাগালের ভেতরে আসতে দাও। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমরা নিতান্ত অসহায় নই।

গার্ড বললে, কিন্তু শত্রুদের কারুকেই তো দেখা যাচ্ছে না! তারা–

তার মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই আবার শোনা গেল দুটো বন্দুকের শব্দ! কিন্তু সে হচ্ছে লক্ষ্যহীনের বন্দুক, গুলি যে কোন দিকে ছুটল আমরা তা টেরও পেলুম না।

কুমার বললে, বন্দুকের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে! ওরা বন্দুক ছুঁড়ছে আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে!

বিনয়বাবু বললেন, এই সুযোগে দৌড়ে আমাদের গাড়ির দিকে যাওয়া উচিত।

কুমার বললে, পিছনে সশস্ত্র শত্রু নিয়ে গাড়ির দিকে দৌড়োতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশের বুকে জ্বলে উঠল একটা সুদীর্ঘ বিদ্যুৎ এবং তারই আলোকে দেখা গেল, খানিক তফাতে একদল লোক দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে।

গার্ড এস্ত স্বরে বললে, ওরা ট্রেনের দিকে যাচ্ছে–ওরা ট্রেনের দিকে যাচ্ছে! ওরা ভেবেছে আমরা আর এখানে নেই!

বিনয়বাবু বললেন, কী সর্বনাশ! ওরা কি ট্রেন আক্রমণ করতে চায়?

কুমার বললে, বিমল, বিমল! ওদের দেখা যাচ্ছে! ওদের নাগালের মধ্যে পেয়েছি!

আমি বললুম, ছোড়ো রিভলভার!

প্রায় একসঙ্গে আমাদের পাঁচটা রিভলভার গর্জন করে উঠল–এবং পরমুহূর্তেই জাগল একটা বিকট আর্তনাদ!

আবার ডাকল বাজ–আবার জ্বলল বিদ্যুৎ-শিখা! এবং আবার গর্জন করলে আমাদের রিভলভারগুলো।

কমল চেঁচিয়ে উঠল, ওরা পালাচ্ছে–ওরা পালাচ্ছে।

আমি বললুম, আবার ছোড়ো রিভলভার!

আমাদের পাঁচটা রিভলভার আর একবার চিৎকার করে উঠল।

রাত্রের শরীরী অভিশাপের মতন অস্পষ্ট মূর্তিগুলো আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকার ও বৃষ্টিধারার অন্তঃপুরে।

বাঘার উৎসাহিত গর্জনে কান পাতা দায়! ভাগ্যে কুমার তাকে সজোরে নিজেরই দুই হাঁটুর ভেতরে চেপে, বাঁ হাতে তার বকলস টেনে ধরেছিল, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে শত্রুদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত!

কমল আহ্লাদে নৃত্য করতে করতে বললে, জয়, আমাদের জয়! বৎসগণ! ভেবেছিলে ফাঁকতালে করবে কেল্লা ফতে? হু-হু, ঘুঘু দেখেছ ফঁদ তো দ্যাখোনি!

তখনি কমলের একখানা হাত ধরে বিনয়বাবু তার নৃত্যোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিলেন।

আমি বললুম, এই হচ্ছে সরে পড়বার সুযোগ! ছোট সবাই ট্রেনের দিকে!

অন্ধকার আর বৃষ্টিধারা কেবল শত্রুদেরই ঢেকে রাখেনি, তাদের আশ্রয় পেয়ে আমরাও নিরাপদে ট্রেনের কাছে গিয়ে পড়লুম।

যাত্রীরা কেউ বাইরে ছিল না। বন্দুক আর রিভলভারের শব্দ লুপ্ত করে দিয়েছে তাদের সমস্ত কৌতূহল। প্রত্যেক কামরার দরজা ও খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিয়ে তারা হয়তো তখন ইষ্টদেবতার নাম জপ করছিল।

আমাদের সঙ্গের সাহেব বললে, ইন্ডিয়া কি ক্রমে আমেরিকা হয়ে উঠল! সশস্ত্র ডাকাত এসে ট্রেন আক্রমণ করে, এদেশে এমন কথা কে কবে শুনেছে?

গার্ড বললে, কামরায় গিয়ে ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে! ইঞ্জিন এখনি গাড়িকে পিছনের স্টেশনে নিয়ে যাবে! বলেই সে দ্রুতপদে চলে গেল।

এমন সময়ে হঠাৎ উপরি-উপরি আরও কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবং কাঠফাটা শব্দ শুনে বুঝলুম, একটা গুলি ট্রেনের কোনও কামরার গায়ে এসে লাগল।

ডাকাতরা কি আমাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে? তারা কি আবার আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

অন্য ক্ষেত্র হলে আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে আবার তাদের উচিতমতো অভর্থনার ব্যবস্থা করতুম। কামরার ভেতরেই আছে আমাদের অটোমেটিক বন্দুকগুলো। তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে পঁয়ত্রিশটা গুলি বৃষ্টি করতে পারে। সেগুলো হাতে থাকলে আমরা পাঁচজনে দুইশত শত্রুকেও বাধা দিতে পারি।

কিন্তু সে-সময় পেলুম না। দূর থেকে বেজে উঠল গার্ডের বাঁশি, গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই! টর্চের আলো ফেলে তাড়াতাড়ি আমাদের কামরা আবিষ্কার করতে বাধ্য হলুম। কোনওরকমে গাড়িতে উঠে পড়বার সময় মাত্র পেলুম।

গাড়ি ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই মাঠের ভেতর থেকে ভেসে এল একটা উচ্চ কোলাহল। সে হচ্ছে মুখের গ্লাস পালিয়ে গেল দেখে ডাকাতদের হতাশার চিৎকার! হতভাগারা অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছিল, সমস্তই ব্যর্থ হল।

ট্রেন পিছু হেঁটে চলেছে-তার গতি খুব দ্রুত নয়। আমাদের কামরার ভেতরেও ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

কুমার বললে, ছি রামহরি, ছিঃ! তুমিও ভয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ইঁদুরের মতন লুকিয়ে আছ!

রামহরি কেমন যেন শ্রান্তস্বরে বললে, মোটেই নয় কুমারবাবু, মোটেই নয়। একবার আলো জ্বেলে দ্যাখো না!

কমল আলো জ্বাললে।

বিপুল বিস্ময়ে দেখলুম, কামরার মেঝের ওপরে শুয়ে রয়েছে রামহরি, তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা!

বিস্ফারিত চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, রামহরি, এ কী ব্যাপার!

ম্লান হাসি হেসে রামহরি বললে, খোকাবাবু, কামরা থেকে তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার। পর আমি জানলায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ওদিকের জানলা দিয়ে জন তিনেক লোক কখন যে নিঃশব্দে কামরায় ভেতরে ঢুকেছিল, আমি একটুও টের পাইনি। আমার অজান্তেই তারা আমাকে আক্রমণ করলে, আমি কোনওরকম বাধা দেওয়ার ফাঁক পর্যন্ত পেলুম না?

কে তারা? চিনেম্যান।

না, পশ্চিমের লোক, হিন্দুস্থানি।

তারপর?

একটা লোক ছোরা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, চাঁচালেই মরবি! আর দুটো লোক আমাদের মোটঘাট, সুটকেসগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল।

ফিরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, আমাদের অধিকাংশ মোটই মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। প্রত্যেক সুটকেসের তালা খোলা।

রামহরি বললে, ভয় নেই তোমাদের, তারা কিছু নিয়ে যায়নি। তাদের ভাব দেখে মনে হল, তারা যেন কোন বিশেষ জিনিসেরই সন্ধান করছে!

কুমার বললে, তবে কি তারা সাধারণ চোর নয়? তারা কি সেই ধুকধুকিখানার লোভেই কামরার ভেতরে ঢুকেছিল?

বিনয়বাবু বললেন, ধুকধুকিখানা তো চিনেম্যানদের সম্পত্তি। আর রামহরি বলছে যারা এসেছিল, তারা হচ্ছে হিন্দুস্থানি।

আমি রামহরির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বললুম, বিনয়বাবু, এই চিনে ডাকাতেরা বড় সহজ লোক নয়। তারা বেশ জানে, ভারতে এসে কাজ হাসিল করতে গেলে এদেশি লোকের সাহায্য না নিলে চলবে না। কারণ, কোনও ছদ্মবেশই চিনেদের মঙ্গোলীয় ছাঁচ ঢাকতে পারবে না, ভারতীয় জনতার মধ্যে তাদের দেখলেই সকলে চিনে ফেলবে। কাজেই তারা এদেশি গুন্ডাদেরও সাহায্য নিয়েছে। তাদের দলের লোক নিশ্চয় ট্রেনের মধ্যে ছিল, আমরা কামরা ছাড়বার পরেই সুযোগ পেয়ে এসেছিল রামহরির সঙ্গে আলাপ করতে।

বিনয়বাবু বললেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এবার থেকে আমাদের দেশি-বিদেশি দুরকম শত্রুর সঙ্গেই যুঝতে হবে? ব্যাপারটা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠছে যে!

কুমার বললে, উঠুক–আমরা থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু রামহরি, তোমার গল্পের শেষটা এখনও তো শোনা হয়নি।

রামহরি উঠে বসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, গল্পটা আরও কিছু বড় হতে পারত, কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল তোমাদের জন্যেই।

আমি বললুম, আমাদের জন্যেই?

হ্যাঁ গো খোকাবাবু, হ্যাঁ। কামরার আলো নিবিয়ে টর্চের আলোয় তারা একমনে খোঁজাখুঁজি করছে, এমন সময়ে বাইরে থেকে এল তোমাদের সাড়া। গার্ডের বাঁশিও শোনা গেল–সঙ্গে সঙ্গে কামরার ভেতর থেকে তারাও তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। আর আমার কথাও ফুরোল।

বিনয়বাবু বললেন, ধুকধুকিখানা তারা খুঁজে পায়নি তো?

আমি হাসতে-হাসতে নীচু গলায় বললুম, ধুকধুকিখানা আছে কলকাতায়।

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, সে কী?

ধুকধুকিখানা একেবারেই বাজে। আসল দরকার তার ভেতরের লেখাটুকু। আমি আর কুমার সেটুকু মুখস্থ করে রেখেছি।

কমল খুশি হয়ে বলে উঠল, বাহবা কি বাহবা। ধুকধুকির লেখা পড়তে হলে ছুন ছিউকে এখন বিমলদা আর কুমারদার মনের ভেতরে ঢুকতে হবে!

আরও খানিকক্ষণ পরে ট্রেন এসে স্টেশনে ঢুকে বিষম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। চারিদিকে মহা হইচই, লোকজনের ছুটোছুটি!

রামহরিকে নিয়ে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। গার্ড আর পুলিশের সঙ্গে ট্রেনের প্রত্যেক কামরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলুম, কিন্তু রামহরি সেই তিনজন লোককে কোথাও আবিষ্কার করতে পারলে না। নিশ্চয়ই তারা মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

সকালবেলায় একদল পুলিশের লোক ঘটনাস্থলে গেল খানাতল্লাশ করবার জন্যে। কিন্তু মাঠ, জঙ্গল ও আশপাশের গ্রাম খুঁজে অপরাধীদের কারুকেই পেলে না। আমার বিশ্বাস, তারা কোনও পাহাড়ে উঠে আত্মগোপন করে আছে।

যথাসময়ে লাইন মেরামত হল। ট্রেন আবার ছাড়ল। দিন-রাত যক্ষপতির রত্নপুরীর সমুজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে-দেখতে আমরা ক্রমেই এগিয়ে চললুম, ভারতের উত্তরসীমান্তের দিকে।

ভারতের উত্তর সীমান্ত আমার মনে চিরদিনই জাগিয়ে তোলে বিচিত্র উত্তেজনা। আফগানিস্থান যখন ছিল হিন্দুস্থানেরই এক অংশ, তখন সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সেখানে হয়েছে কত না অদ্ভুত নাটকের অভিনয়! শক, তাতার, হূণ, মোগল, চিন, পারসি ও গ্রিক প্রভৃতি জাতির-পর-জাতি এই পথ দিয়েই মূর্তিমান ধ্বংসের মতন ছুটে এসেছে সোনার ভারত লুণ্ঠন করবার জন্যে। দেশরক্ষার জন্যে যুগে-যুগে ভারতের কত লক্ষ-লক্ষ বীর ঢেলেছে সেখানে বুকের রক্তধারা! ওখানকার আকাশছোঁয়া পাহাড়ের শিখরে শিখরে আজ বাতাসে-বাতাসে যে অশ্রান্ত গান জেগে ওঠে, সে হচ্ছে এই প্রাচীন ভারতেরই অতীত গৌরবগাথা। ঐতিহাসিক ভারতের সর্বপ্রথম সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত ওই পথ দিয়েই ভারতের শত্রু গ্রিকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর্যাবর্তের বাইরে। যে পার্বত্যজাতি প্রচণ্ড রণোন্মাদ পৃথিবীজয়ী আলেকজান্ডারকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তাদের সুযোগ্য বংশধররা আজও সেখানে বর্তমান আছে। এই বিংশ শতাব্দীর উড়োজাহাজ আর কলের কামানও তাদের যুদ্ধোন্মাদ শান্ত বা তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারেনি। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ-সিংহ আজও সেখানে ঘুমোবার অবসর পায় না। আজকের ভারতে

যারা সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়ায়, ভারতের উত্তর সীমান্ত পূর্ণ করতে পারে তাদের মনের প্রার্থনা।

বিনয়বাবুর মুখে শুনলুম, আফগানিস্থানের মধ্যে কাফ্রিস্থান হচ্ছে এক রহস্যময়, অদ্ভুত দেশ। ওখানকার লোকজন, আচার-ব্যবহার সমস্তই নতুনরকম। আমাদের যক্ষপতির ঐশ্বর্য আছে ওই কাফ্রিস্থানেই। ওইখানেই উঠবে পরের দৃশ্যের যবনিকা।

.

অষ্টম পরিচ্ছেদ। কাফ্রিস্থানের কথা

মালাকান্দ গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে আগে পড়লুম সোয়াট, তারপর ডির মুল্লুকে; তারপর উঠলুম লোয়ারি গিরিসঙ্কটের (দশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু) ওপরে এবং তারপরে পৌঁছেলুম চিত্রল রাজ্যে।

এসব জায়গার বেশি বর্ণনা দেওয়ার দরকার নেই, কারণ আমাদের গন্তব্যস্থান হচ্ছে কাফ্রিস্থান। তবে অল্প দু-চার কথা বললে মন্দ হবে না।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে অপূর্ব, সে কথা বলা বাহুল্য। আমাদের মতন সমতল দেশের বাসিন্দাদের চোখ আর মন এই অসমোচ্চে পর্বত সাম্রাজ্যে এসে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। নানা আকারের শৈলমালার এমন বিচিত্র উৎসব আমি আর কখনও দেখিনি। এই চিত্রল যে কীরকম বন্ধুর দেশ, একটা কথা বললেই সকলে সেটা বুঝতে পারবেন। এ অঞ্চলে মোটঘাট স্থানান্তরিত করবার জন্যে কেউ মালগাড়ি ব্যবহার করে না, কারণ তা অসম্ভব। চিত্রলীদের অভিধানে নাকি গাড়ির চাকা বোঝায় এমন কোনও শব্দই নেই। তবে চিত্রলের শাসনকর্তার (Mehtar) দৌলতে আজকাল ওখানে খানকয় মোটরের আবির্ভাব হয়েছে বটে।

এ হচ্ছে কেবল পনেরো, ষোলো, সতেরো হাজার ফুট উঁচু আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দেশ– খালি চড়াই আর উতরাই, খাদ আর উপত্যকা, শৈলশিখরের পর শৈলশিখরের নিস্পন্দ

তরঙ্গ! দূরে-দূরে দেখা যায় আরও উঁচু শৈলমালার ওপরে চিরতুষারের শুভ্র সমারোহ। আমাদের একমাত্র সহায় এদেশি পনি ঘোড়া–অতি ভয়াবহ, উঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথেও এসব ঘোড়ার পা একবারও পিছলায় না কিন্তু একবার পিছলোলে আর রক্ষা নেই, কারণ পরমুহূর্তে তোমাকে নেমে যেতে হবে হাজার-হাজার ফুট নীচে কোথায় কোন অতলে। ইহলোক থেকে একেবারে পরলোকে।

একদিন দুপুরবেলায় নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে চলেছি, নির্মেঘ আকাশ পরিপূর্ণ রৌদ্রে ঝলমল করছে, আচম্বিতে দূরে জাগলে ঘনঘোর মেঘগর্জন!

আমার বিস্মিত মুখের পানে তাকিয়ে গাইড হাসতে-হাসতে বললে, বাবুজি, ও মেঘের ডাক নয়।

তবে?

পাহাড় ভেঙে পড়ছে।

এদেশে প্রায়ই পাহাড় ভেঙে পড়ে নাকি?

প্রায়ই। লোকজন হামেশাই মারা পড়ে। সময়ে-সময়ে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।

এই হিংস্র পাহাড়ের দেশে মানুষদেরও প্রকৃতি রীতিমতো বন্য। আমরা যে সোয়াট ও ডির দেশ পিছনে ফেলে এসেছি, সেখানকার মুসলমানদের ধর্মোন্মাদ ভয়ংকর। বিধর্মীদের হত্যা করা বলতে তারা বোঝে, স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা সাফ করা।

সোয়াট আর ডির দেশের মধ্যে মারামারি হানাহানি লেগেই আছে। লড়তে মারতে ও মরতে তারা ভালোবাসে রক্ত ও মৃত্যু যেন তাদের প্রিয় বন্ধু!

একদিন যেতে-যেতে দেখি এক জায়গায় দুই দল করছে মারামারি। বন্দুক গর্জন করছে, বনবন লাঠি ঘুরছে আর ঝকমক জ্বলছে তরবারি! দস্তুরমতো যুদ্ধ। মাটিতে পড়ে কয়েকটা

আহত দেহ ছটফট করছে এবং কয়েকটা দেহ একেবারে নিস্পন্দ–অর্থাৎ এ জীবনে তারা আর নড়বে না।

কিন্তু তাদের কেউ তখন বিধর্মী বধ করে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে আগ্রহ। দেখালে না, বরং আমাদের দেখে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের গাইড ভয়েভয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ছুটে এসে বললে, বাবুজি, এখান থেকে চলে আসুন। পাছে আমরা জখম হই, তাই ওরা লড়াই করতে পারছে না।

মনে-মনে ওদের সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। তারপর রাস্তার মোড় ফিরে একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে হইচই শুনেই বুঝলুম, ওদের যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয়েছে।

কুমার বললে, এরা লড়াই করছে কেন?

গাইড বললে, এক পয়সার পেঁয়াজের জন্যে!

চিত্রলের পরেই হচ্ছে কাফ্রিস্থান। এদেশটি এখন আফগানিস্থানের আমিরের শাসনাধীন হয়ে মুসলমান প্রধান হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু এখানকার মুসলমানরা খুব বেশি গোঁড়াও নয়, তাদের আচার-ব্যবহারও একেবারে অন্যরকম। কিন্তু এখনও এদেশে পুরোনো কাফিদের এমন এক সম্প্রদায় বাস করে, যারা পৈতৃক রীতিনীতি ও পৌত্তলিকতা বর্জন করেনি। নানান দেবতার কাঠের মূর্তি গড়ে তারা পূজা করে এবং তাদের প্রধান-প্রধান দেবতার নাম হচ্ছে : ইস্র, মণি, গিষ, বাগিষ্ট, আরম, সানরু, সাতারাম বা সুদারাম। ওঁরা হচ্ছেন পুরুষ-দেবতা। দেবীদের নাম দিয়েছে ওরা সঞ্জীরক্তী, দিজোন, নির্মলী ও সুমাই প্রভৃতি। অনুমানে বেশ বোঝা যায়, এদের দেব-দেবী হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীরই রূপান্তর।

কাফ্রিস্থান বলতে বুঝায় কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের দেশ। বলা বাহুল্য, এ নামটি মুসলমানদের দেওয়া। হিন্দুদের পরে একসময়ে এখানে ছিল চিনাদের প্রভুত্ব। তার কিছু

কিছু চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। আমাদের চোখের সামনে নাচছে যে গুপ্তধনের স্বপ্ন, তারও মালিক ছিলেন এক চিনা রাজপুত্র। সেই গুপ্তধন আছে এক বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। সুতরাং এ-অঞ্চলে আগে বৌদ্ধদেরও প্রাধান্য ছিল। তারপর মুসলমানরা বারেবারে আক্রমণ করেছিল কাফ্রিস্থানকে। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লং প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীরাও নাকি এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কারুর প্রাধান্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নিজের চারিদিকে মুসলমান প্রতিবেশী নিয়েও গত শতাব্দী পর্যন্ত কাফ্রিস্থান আপন স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পেরেছিল।

কাফিররা দেখতে সুন্দর। তাদের গায়ের রং প্রায় গৌর, দেহ লম্বা, মুখ চওড়া, চোখ গ্রিকদের মতো। শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা বলে তারা স্নান করতে একেবারেই নারাজ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে তাদের চেহারা যে আরও চমৎকার হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই!

কি মুসলমান ও কি পৌত্তলিক কাফির প্রত্যেকেই পরিবারের কেউ মারা পড়লে, গাঁয়ের প্রান্তে নির্দিষ্ট এক ঢালু পাহাড়ের গায়ে উঠে চার পায়াওয়ালা বড় সিন্দুকের ভেতরে মৃতদেহ রেখে আসে। তারা শবদেহ গোর দেয় না। এক-একটি পারিবারিক সিন্দুকের ভেতরে পরে পরে দুটো, তিনটে বা চারটে মৃতদেহও রাখা হয়।

কাফিররা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যন্ত নাচের ভক্ত। সামাজিক বা ধর্মসংক্রান্ত যে-কোনও অনুষ্ঠানে তারা নাচের আসর বসায় এবং মেয়ে ও পুরুষরা একসঙ্গে দল বেঁধে সারা রাত ধরে নাচের আমোদে মেতে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে চলে গান ও দামামা। অনেকে দুই আঙুল মুখে পুরে তীব্র স্বরে শিস দেয়। পরিদের ওপরে এদের অগাধ বিশ্বাস। নাচতে নাচতে কেউ-কেউ পরি দেখে দশা পায়। তখন তারা নাকি ভাববাণী ও ভবিষ্যবাণী বলতে পারে! সবাই তাদের কাছে গিয়ে আগ্রহ ভরে এইরকম সব প্রশ্ন করে–এবারে কীরকম ফসল হবে?–এ বছরে গাঁয়ে মড়ক হবে কিনা? –আমার খোকা হবে না খুকি হবে?

পৌত্তলিক কাফিররা মুসলমানদের বিষম শত্রু। এর কারণ বোঝাও কঠিন নয়। মুসলমানরা–অর্থাৎ আফগান প্রভৃতি জাতের লোকেরা চিরদিনই তাদের ওপরে অমানুষিক

অত্যাচার করে এসেছে, কাফিররাও তাই সুযোগ পেলেই ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের হত্যা করে। কেউ লুকিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মুসলমানকে বধ করতে পারলে কাফির-সমাজে বীর বলে গণ্য হয়। তাদের মাথার পাগড়িতে গোঁজা পালকের সংখ্যা দেখেই বলে দেওয়া যায়, কে কয়জন মুসলমানকে হত্যা করেছে। আমরা যখন কাফ্রিস্থানে গিয়েছিলুম তখনই এ-শ্রেণির মুসলমান। বিদ্বেষী কাফিররা দলে যথেষ্ট হালকা হয়ে পড়েছিল। আজ তাদের সংখ্যা বোধহয় নগণ্য, কারণ ওদেশে মুসলমান ধর্মের প্রভুত্ব বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

কাফিরদের প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় মৃত ব্যক্তিদের অশ্বারোহী কাঠের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। পৌত্তলিক হোক, মুসলমান হোক, পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা প্রত্যেক কাফিরই কর্তব্য বলে মনে করে। যার যেমন সঙ্গতি, সে তত বড় মূর্তি গড়ায়। কিন্তু এসব হচ্ছে নামেই প্রতিমূর্তি, কারণ দেখতে সব মূর্তিই অবিকল একরকম!

কাফিররা মাছ খায় না, মাছে তাদের ভীষণ ঘৃণা। ব্যাং বা টিকটিকি খেতে বললে আমাদের অবস্থা যেরকম হয়, মাছ খেতে বললে তারাও এইরকম ভাব প্রকাশ করে। কাফিররা মুরগির মাংসও অপবিত্র মনে করে কারণ, তা মুসলমানদের খাদ্য এবং কাফির নারীদের পক্ষে পুরুষ জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ!

কাফিররা পরি মানে এবং কাফ্রিস্থানকে সত্য-সত্যই পরিস্থান বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দৃষ্টিসীমা জুড়ে দূরে বিরাজ করছে ২৫,৪২৬ ফুট উঁচু টেরিচ-মির পর্বত, বিরাট দেহ তার চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা এবং তার শিখর উঠেছে মেঘরাজ্য ভেদ করে। নীচেও সর্বত্রই অচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় প্রহরীর দল। এখন শীতকাল নয়, নইলে এসব পাহাড়ও পরত তুষার পোশাক এবং তাদের উপত্যকা ও অলিগলি দিয়ে প্রবাহিত হত তুষারের নদনদী। শীতকালে এখানকার অনেক গ্রাম বাহিরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে পারে না তাদের মাথার ওপর দিয়ে বইতে থাকে বরফের ঝড়, তাদের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বরফের স্তূপ!

কিন্তু গ্রীষ্মকালে সমস্ত কাফ্রিস্থান ছেয়ে যায় ফুলে-ফলে। কোথাও বেদানা ও আঙুরের ঝোপ, কোথাও মনোরম সবুজে ছাওয়া বনভূমি–তাদের ওপরে ঝরে পড়ছে নিঝরের কৌতুক হাসি এবং নীচে দিয়ে নেচে যাচ্ছে গীতিময়ী নদী। পাহাড়ের তলার দিকে ঢেকে থাকে জলপাই ও ওকগাছের শ্যামলতা এবং পাথরের ধারে-ধারে ফলে আছে আখরোট, উঁত, খুবানী, দ্রাক্ষা ও আপেল গাছ। আরও ওপরে উঠলে দেখা যায় দেবদারু গাছের বাহার। ফুলও ফোটে যে কতরকম তার ফর্দ দেওয়া অসম্ভব।

এই হল গিয়ে কাফ্রিস্থানের মোটামুটি বর্ণনা।

.

নবম পরিচ্ছেদ। পাহাড়ে মেয়ে

চিত্রল থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে আড্ডা গেড়েছি। এখানে দিন দুই-তিন থাকব স্থির করেছি–কেবল বিশ্রামের জন্যে নয়, দরকারি খবরাখবর নেওয়ার জন্যেও।

এ-গ্রামের বাড়িগুলোর অবস্থান বড় অদ্ভুত। দুর থেকে বাড়িগুলোকে দেখায় গ্যালারির মতো। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাড়িগুলো থাকে-থাকে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে।

এখানে বাড়ি তৈরির নিয়মও আলাদা। তার প্রধান উপাদান হচ্ছে কাঠ, পাথর আর কাদা। কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসানো হয় বড়-বড় পাথরের-পর-পাথর এবং কাদা দিয়ে সারা হয় সুরকির কাজ। ছাদ মাটির। রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ারেও আমি পাকা বাড়ির মাটির ছাদ দেখেছি। এর কারণ জানি না।

যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে সে হচ্ছে একটি আধাবয়সি স্ত্রীলোক, নাম গুমলি। বিধবা। এ-গ্রামে তার পসার প্রতিপত্তি বড় কম নয় দেখলুম।

রামহরি মুসলমানের বাড়িতে অতিথি হতে রাজি নয়–জাত খোয়াবার ভয়ে। সে-ই খুঁজে-খুঁজে গুমলিকে আবিষ্কার করেছে। গুমলি পুরোনো কাফির ধর্ম অর্থাৎ পৌত্তলিকতা–ত্যাগ করেনি।

গুমলি লোক ভালো, অতিথি সৎকার করতে খুব ভালোবাসে। আমাদের প্রধান খাদ্য হয়েছে ঘি-জবজবে চাপাটি আর খাসির মাংস। তার ওপরে পিঠা ও অন্যান্য খাবারেরও অভাব নেই।

কমল জানতে চাইলে, এখানে মুরগি পাওয়া যায় কি না?

গুমলি ঘৃণায় নাক তুলে থুতু ফেলে বললে, ছি-ছি, মুরগি খায় মুসলমানরা, আমার বাড়িতে মুরগি ঢোকে না।

সে পুস্তো ভাষায় যা বললে, বিনয়বাবু তা বাংলায় তরজমা করে আমাদের শোনালে। এদেশে তিনিই আমাদের দোভাষীর কাজ করছেন।

রামহরি পরম শ্রদ্ধাভরে বললে, গুমলি বড় পবিত্র মেয়ে, সে তোমাদের মতো ম্লেচ্ছ নয়।

গুমলি বললে, বাবুজিরা যদি গরুর মাংস খেতে চান, আমি খাওয়াতে পারি।

রামহরি দুই চোখ ছানাবড়ার মতো করে বললে, কী সর্বনাশ, এরা মুরগি খায় না, কিন্তু গরু খায় নাকি? অ্যাঁঃ তবে তো এদের হেঁসেলে খেয়ে আমার জাত গিয়েছে! হে বাবা ভগবান, এ তুমি আমার কী করলে? লুকিয়ে লুকিয়ে জাতটি কেড়ে নিলে?

বাবা ভগবানের কাছ থেকে প্রশ্নের কোনও উত্তর বা সান্ত্বনা না পেয়ে রামহরি কাঁদো কাঁদো মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে সে ফিরে এল বটে, কিন্তু গুমলির বাড়িতে আর জলগ্রহণ করলে না।

কাফিররা দশজনকে খাওয়াতে ভারি ভালোবাসে। শুনলুম বড়-বড় ভোজ দিয়ে অনেকে ফতুর হতেও ভয় পায় না। অতিথি-সকারের আইনও এখানে বেজায় কড়া। যে ভোজ দেয়। সে যদি ভালো খাবার না খাওয়ায়, তাহলে তার জরিমানা হয়!

সন্ধ্যার আগে সবাই মিলে বেড়াতে গেলুম। সেদিন কাফিরদের কী একটা উৎসব ছিল, তাই মেয়েপুরুষ মিলে নাচের আমোদে মেতেছে। খানিকক্ষণ নাচ দেখে চললুম নদীর ধারে। আমি আগে-আগে এগিয়ে গিয়ে নদীর জলে হাত দিলুম। উঃ, কী কনকনে ঠান্ডা জল! বুঝলুম কোনও বরফের পাহাড় থেকে নেমে আসছে এই নদী।

আচম্বিতে পিছনে দূর থেকে কুমারের চিত্তার জাগল–বিমল, বিমল! পালিয়ে এসো–শিগগির পালিয়ে এসো।

চমকে ফিরে দেখি, কোথা থেকে গুমলি আবির্ভূত হয়ে হাত-মুখ নেড়ে উত্তেজিতভাবে কথা কইছে! সে কী বলছে শুনতে পেলুম না, কিন্তু তারপরেই দেখলুম, বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার, কমল ও রামহরি বেগে দৌড় মারলে! বোঝা গেল ভয়েই তারা পালাচ্ছে, কিন্তু কেন পালাচ্ছে বোঝা গেল না।

তারপরেই শুনলুম বহু নারীকণ্ঠে বিষম চিৎকার! দেখি দলে-দলে কাফির নারী চাঁচাতে চ্যাঁচাতে ও ছুটতে-ছুটতে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

তবে কি এই নারীদের ভয়েই ওরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল? কী আশ্চর্য, এরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়? আমাদের শত্রুরা কি নিজেরা আড়ালে থেকে এই নারী-সৈন্য নিযুক্ত করেছে? এখন আমার কী করা উচিত? পালাব? নারীর ভয়ে পালাব? হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই! আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের গায়ে তো আর হাত তুলতে পারি না।

কিন্তু এখন আর পালানোও অসম্ভব! সেই বিপুল নারীবাহিনী তখন পঙ্গপালের মতো চারিধার থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে! আর নারী বলে তাদের কারুকে তুচ্ছ করবারও

উপায় নেই! তাদের কেহই বাংলাদেশের ভেঙেপড়া লতার মতন মেয়ে নয়, তাদের অধিকাংশই সাধারণ বাঙালি পুরুষেরও চেয়ে মাথা উঁচু শক্ত ও বলিষ্ঠ তাদের দেহ!

আমি রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম–এমন অদ্ভুত সমস্যায় কখনও আর পড়িনি। বিকট স্বরে চেঁচিয়ে মেয়ের দল সবেগে আমাকে আক্রমণ করলে! আর সে এমন বিষম আক্রমণ যে, স্বয়ং ভীমসেন তাঁর বিরাট গদা ঘুরিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারতেন না।

ভীতু ভেড়ার মতন আমি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলুম। তারা ছিনেজোঁকের মতন আমাকে চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল এবং তারপর আমি কিছু বোঝবার আগেই আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে একেবারে নদীর ভেতরে ফেলে দিল!

ঝুপ করে জলে পড়লুম। নদী সেখানে গভীর নয় বটে, কিন্তু সেই বরফ-গলা জলে আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল, নাকানিচোবানি খেয়ে অসাড় দেহটাকে কোনওরকমে টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, মেয়ের পাল সকৌতুকে হাসতে-হাসতে আর একদিকে চলে যাচ্ছে। তবে কি এটা হচ্ছে ওদের ঠাট্টা? মেয়েমানুষ তেড়ে এসে জোয়ান পুরুষকে ধরে বেড়ালছানার মতন জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়–এ কীরকম সৃষ্টিছাড়া দেশ? প্রাচীন গ্রিক সৈনিকরা নাকি এক জাতের বীর নারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে প্রাচীন কাফির নারীদের কোনও সম্পর্ক নেই তো?

কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে চললুম। পথের চারিদিকেই মেয়ের দল হুড়োহুড়ি করে বেড়াচ্ছে, পাছে আবার তাদের পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে মানে-মানে আমি পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলুম–কিন্তু তারা কেউ আর আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে না।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম। আজ যেন এ দেশটা দস্তুরমতো মেয়ে-রাজ্যে পরিণত হয়েছে–পথে পুরুষ খুব কম, কেবল মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে! যে কয়জন পুরুষের সঙ্গে দেখা হল তাদের প্রত্যেকেরই জামাকাপড় ভিজে সপসপ করছে। একটু পরেই সব রহস্য বোঝা গেল।

বাসায় ঢুকতেই কুমার, কমল আর রামহরি অট্টহাস্য করে উঠল। বিনয়বাবুও বোধহয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা হেসে নিলেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, যত সব কাপুরুষ! ভয়ে পালিয়ে এসে আবার দাঁত বার করে হাসতে লজ্জা করছে না?

কুমার বললে, স্বীকার করছি ভাই, আমরা হচ্ছি পয়লা নম্বরের কাপুরুষ। এই সব পাহাড়ে মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু হে বীরবর, তোমার চেহারা। এমন ভগ্নদূতের মতো কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি কাপড়চোপড় বদলাতে লাগলুম।

বিনয়বাবু বললেন, ভায়া বিমল, কুমার তোমাকে সাবধান করে দিলে, তবু তুমি আমাদের সঙ্গে পালিয়ে এলে না কেন?

কেমন করে আমি বুঝব যে ওই দজ্জাল মেয়েগুলো আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে?

আমরাও আগে বুঝতে পারিনি। ভাগ্যে গুমলি এসে সাবধান করে দিলে, তাই আমরা মানে-মানে মাথা বাঁচাতে পেরেছি।

কিন্তু এ প্রহসনের অর্থ কী?

আজ এখানে যে উৎসবটা হয়ে গেল, এর শেষে এখানকার মেয়েরা পুরুষদের ধরে নদীর জলে হাবুডুবু খাইয়ে দেয়। এটা হচ্ছে কাফিরদের লোকাঁচার-এর বিরুদ্ধে পুরুষদের কোনও জারিজুরিই খাটে না।

তাই নাকি। তাহলে গুমলির কাছ থেকে জেনে রাখবেন, ওদের এরকম আরও লোকাঁচার আছে কি না?

.

অজানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের ও নিত্যনতুন দৃশ্য সমারোহের মধ্যে আমরা ছুন-ছিউ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। তারা যে এখনও আমাদের পিছনে লেগে আছে, এমন সন্দেহ করবার কোনও কারণও পাইনি। অন্তত তারা যে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি, এ বিশ্বাস আমার ছিল।

কিন্তু হঠাৎ বোঝা গেল, আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত।

আজ বৈকালে মুখ অন্ধকার করে গুলি এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর যেন আপন মনেই বললে, বামুক লোকটা মোটেই সুবিধের নয়!

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বামুক? সে আবার কে?

সে হচ্ছে এই গাঁয়ের জাস্ট। (জাস্ট–অর্থাৎ সময়।)।

.

দশম পরিচ্ছেদ । বেড়া জালে

গুমলির মুখের ভাব দেখে আমাদের সকলেরই মনে খটকা লাগল। কিন্তু এই অজানা গাঁয়ের অচেনা সর্দার যদি সুবিধার লোকও না হয়, তাতে আমাদের কী ক্ষতি হবে?

বিনয়বাবু জিগ্যেস করলেন, লোকটা সুবিধের নয় বলছ কেন?

আজ দুপুরবেলায় আমি ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলুম। ফেরবার পথে দেখলুম, পাহাড়ের একটা ঝোপের ছায়ায় বসে আছে বামুক আর দুটো চিনেম্যান।

বিনয়বাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, চিনেম্যান?

হ্যাঁ বাবুজি। তারা চুপিচুপি কী বলাবলি করছিল, আমাকে দেখেই একেবারে চুপ মেরে গেল। আমি কোনও কথা না বলে এগিয়ে এলুম। খানিক দূর এসেই ফিরে দেখলুম, বামুক আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিনেম্যান দুটোকে কী যেন বলছে।

তারপর?

তারপর তখন আর কিছু হল না। কিন্তু এইমাত্র বামুক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

কেন?

হতভাগা আমাকে কী বলে জানেন বাবুজি? আজ রাত্রে আমি যদি আপনাদের খাবারের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে আর সদরদরজা খুলে রাখতে পারি, তাহলে সে আমাকে পাঁচশো টাকা বকশিশ দেবে। অর্ধেক টাকা সে এখনি দিতে চায়।

বকশিশের লোভ তোমার কাছে নাকি?

আছে বাবুজি, আছে!

মানে?

মুখপোড়া বামুকের কাছ থেকে বকশিশের আগাম আড়াইশো টাকা আমি আদায় করে নিয়েছি।

গুমলি!

ঘাবড়াবেন না বাবুজি, ঘাবড়াবেন না। বামুক হচ্ছে পাজির পা ঝাড়া, মানুষ মারতে তার হাত এতটুকুও কঁপে । সে কাফির হলেও আমাদের ধর্ম ছেড়েছে, তাই তাকে আমরা পরম শত্রু বলেই মনে করি। তাকে ঠকিয়ে যদি আড়াইশো টাকা লাভ করতে পারি, তাহলে আমার কোনও পাপ হবে না।

গুমলি, আমরা এখনি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাই।

ভয় নেই বাবুজি। যখন সবকথা প্রকাশ করলুম, তখন আপনাদের খাবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি বিষ মাখিয়ে দেব না। বামুকের মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, তবে তার অর্ধেক টাকা যখন নিয়েছি, অর্ধেক কাজও আমি করব।

অর্থাৎ?

আজ রাত্রে সদর দরজাটা খুলে রাখব।

তারপর?

তারপর রাত্রে কেউ আমার বাড়িতে ঢুকলে ভালো করেই তাকে আদর-যত্ন করব। গরক, বাচিক, কারুক আর মাল্কানকে খবর দিয়েছি, তারা এল বলে।

তারা আবার কে?

আমার বিশ্বাসী লোক আমার কথায় তারা ওঠে বসে। আজ রাত্রে তারা আমার বাড়িতে পাহারা দেবে।

বিনয়বাবু যখন সব কথা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তখন আমিও বললুম, আমিও গুমলির মতে সায় দি। শঠের সঙ্গে শঠতা করতে কোনও দোষ নেই। আসুক ছুন-ছিউ, আসুক বামুক! এখানে এলেই তারা দেখতে পাবে, মড়ারা জ্যান্ত হয়ে বন্দুক ধরে বসে আছে!

কুমার কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, গুমলি ঠাকরুণ! তোমার বাকি আড়াইশো টাকাও মারা যাবে না। ও টাকাটাও আমরা নিজেদের পকেট থেকে তোমায় দেব!

গুমলি একগাল হেসে সেলাম করে বললে, বাবুজি মেহেরবান!

পাহাড়ের টঙে কাফ্রিদের ছোট্ট গাঁ, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল প্রথম রাত্রেই। রাত যত গম্ভীর হয় স্তব্ধতা ততই থমথমে হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন বোবা দুনিয়ায় জেগে আছে কেবল গোটাকয়েক বদরাগি কুকুর।

সদর দরজার পাশেই একটা ঘর তার মধ্যে আলো নিবিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কুমার, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে একটা করে রিভলভার। এই সংকীর্ণ স্থানে বন্দুকের সাহায্য দরকার হবে না।

গরক, বাচিক, কারুক আর মাল্কানও এসেছে। তারা সবাই হচ্ছে কাফ্রিদের পুরাতন ধর্মের লোক। প্রত্যেকেরই দেহ প্রায় ছয় ফুট করে লম্বা, সারা গায়ে কঠিন মাংসপেশির খেলা। তারা কথা কয় কম, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বেশ বোঝা যায়, আমাদের সাহায্য করবার জন্যে তারা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গরক ও বাচিক বাড়ির ছাদের ওপরে বসে আছে, পাহারা দেওয়ার জন্যে। কারুক আর মাল্কান অপেক্ষা করছে গাঁয়ের পথে, শত্রুরা দেখা দিলেই তারা আমাদের সাবধান করে দেবে। প্রথমে তারা আমাদের সঙ্গে বাড়ির ভেতরেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি বাড়ির ভেতরে পাঁচটা রিভলভারই যথেষ্ট, তারা যদি যথাসময়ে শত্রুদের আগমন সংবাদ দিতে পারে, তাহলেই আমাদের যথার্থ উপকার করা হবে।

রাতের অসাধারণ নীরবতার মাঝে আমাদের হাতঘড়িগুলোর টিকটিক শব্দ যেন রীতিমতো কোলাহল বলে মনে হচ্ছে!

বাঘা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, আমরা কোনও অযাচিত ও অনাহূত অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে আমার কোল ঘেঁষে কান খাড়া করে বসে আছে।

আচম্বিতে দূর পথ থেকে ভেসে এল একটা বিড়ালের ম্যাও ম্যাও চিৎকার। তারপরই ছাদের ওপর থেকে সাড়া দিলে আর একটা বিড়াল!

এই হল আমাদের সঙ্কেতধ্বনি! এর মানে, এখনি হবে শত্রুদের আবির্ভাব।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

বিনয়বাবু চুপিচুপি বললেন, আমরা কী করব?

বিশেষ কিছু না। এখানে সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলে পুলিশ হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে। বদমাইশগুলোকে কিছু ভয় দেখাতে বা সামান্য জখম করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রামহরি, বাঘাকে সামলে রাখো। কুমার, শত্রুরা যখন পালাবে তখন তোমরা সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে তাদের পেটের পিলে চমকে দিতে পার।

এক, দুই করে প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট কাটল। তারপরেই একটু একটু করে সদর দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে ক্রমেই বেশি চাঁদের আলো এসে পড়তে লাগল। সদর দরজা একেবারে খুলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো পোশাক পরা তিনতিনটে মূর্তি।

প্রথম মূর্তিটার পা লক্ষ করে আমি রিভলভার ছুড়লুম। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে মাটির ওপরে বসে পড়ল।

আমার রিভলভার আরও দুইবার গর্জন করলে কিন্তু এবারে আমি আর কারুকে লক্ষ করিনি।

যে পায়ে চোট খেয়ে বসে পড়েছিল, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রাণের ভয়ে ছুটতে শুরু করলে! অন্য দুজনও দাঁড়াল না।

ছাদের ওপর থেকে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হতে লাগল–নিশ্চয় গরক ও বাচিকের কীর্তি। কুমার প্রভৃতিও ঘর থেকে বেরিয়ে ঘন-ঘন রিভলভার ছুঁড়তে লাগল আর বাঘার চাঁচামেচির তো কথাই নেই। শান্তিপূর্ণ মৌন রাত্রি যেন কর্কশ শব্দের চোটে হঠাৎ বিষাক্ত হয়ে উঠল।

তারপরেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল, দুজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকেই আসছে। প্রথমটা তাদের শত্রু ভেবে আমি আবার রিভলভার তুললুম, কিন্তু তারপরেই দেখি তারা হচ্ছে আমাদের লোক কারুক আর মাল্কান।

মাল্কান কাছে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, পশ্চিম দিক থেকে অনেক লোক এই দিকেই আসছে!

অনেক লোক! কত?

তা বিশ-বাইশ জনের কম হবে না!

তারাও কি আমাদের শত্রু?

তাই তো মনে হচ্ছে বাবুজি! এত রাতে ভালো লোকেরা দল বেঁধে কখনও পাহাড় পথে চলে না!

এমনসময়ে ছাদের ওপর থেকে গরক চিৎকার করে বললে, হুশিয়ার বাবুজি, হুঁশিয়ার! পুব দিক থেকে অনেক আদমি আসছে!

কারুক সভয়ে বললে, কী মুশকিল! দুশমনরা কি বাড়িখানা ঘিরে ফেলতে চায়?

কারুক বোধহয় ঠিক আন্দাজই করেছে! হয়তো আমাদের বেড়াজালেই ধরা পড়তে হবে।

.

একাদশ পরিচ্ছেদ। মৃত্যুর হুঙ্কার

দু-দিক থেকে শত্রুরা আসছে দলে-দলে, হয়তো পালাবার সব পথই বন্ধ করে আমাদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

জানি, আমাদের পাঁচজনের কাছে আছে পাঁচটা স্বয়ংবহ বন্দুক বা অটোমেটিক রাইফেল তাদের প্রত্যেকটা মিনিট গুলিবৃষ্টি করতে পারে পঁয়ত্রিশবার! সুতরাং শত্রুরা যে সহজে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি অপরিচিত শত্রুদের স্বদেশে; গুমলির বাড়িখানা এখানে আমাদের পক্ষে মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতন বটে, কিন্তু সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধে আমরা পাঁচজনে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারব? আর আমাদের আশ্রয় দিয়ে গুমলিই বা বিপদে পড়বে কেন? শত্রুরাও নিশ্চয় নিরস্ত্র নয় এবং ওদের দলে যদি শয়তান ছুন-ছিউ থাকে তাহলে ওদের সঙ্গেও যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, এটাও অনুমান করতে পারি। অতএব আমাদের আশ্রয়দাত্রী এই বিদেশিনী নারীর বাড়ির অঙ্গনকে যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা বোধহয় সঙ্গত নয়।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই–প্রতি মুহূর্তেই শত্রুরা আরও কাছে এসে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, মাল্কান, আমাদের পালাবার কোন পথই কি খোলা নেই?

মাল্কান যা বললে বিনয়বাবু তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন–একটা পথ আছে বাবুসাহেব!

কোথায়?

বাড়ির খিড়কি দিয়ে বেরুলে উত্তরদিকে একটা সরু পাহাড়ে পথ পাওয়া যাবে।

উত্তরদিকে? মাল্কান, আমরা কী দেখবার জন্যে এদেশে এসেছি সেকথা তুমি বোধহয় জানো না?

জানি বাবুসাহেব! গুমলি বিবির মুখে আমি সব শুনেছি কারণ আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে আমারই ওপরে। আপনারা তো সেকালের সেই ভাঙা মঠ দেখতে যেতে চান?

হ্যাঁ। সে মঠও তো উত্তরদিকে?

হ্যাঁ বাবুসাহেব।

এখান থেকে সে মঠ কত দূরে?

তা প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল হবে।

তুমি এখনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?

এখনি?

হ্যাঁ মাল্কান। যদি রাজি হও, একশো টাকা বকশিশ পাবে।

মাল্কান ইতস্তত করছিল, কিন্তু এই দরিদ্র কাফ্রিস্থানে একশো টাকা হচ্ছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য! সে মহা উৎসাহে বলে উঠল, বাবুসাহেব, আমি যেতে রাজি!

আসছে কাল সকালেই আমাদের এখান থেকে বেরুবার কথা বলে আমরা আগে থাকতেই মোটঘাট বেঁধে রেখেছিলুম।

হুট বলতে ছুট দেওয়ার অভ্যাস আমাদের বরাবরই। এ হপ্তায় আমরা কলকাতার শৌখিন নাগরিক, আসছে হপ্তায় আফ্রিকার বিপুল অরণ্যে বনবাসী! এমনি ভবঘুরের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে একটা ভালো শিক্ষা আমরা পেয়েছি। প্রবাসে যেতে হলে বাঙালিরা মস্ত বড় গৃহস্থালি ঘাড়ে করে বেরোয়-বড়-বড় ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানা, পোঁটলা-পুঁটলি। কিন্তু কত কম জিনিস সঙ্গে নিয়ে পথে-বিপথে অনায়াসেই দৈনিক জীবনযাপন করা যায়, সে সমস্যা আমরা সমাধান করতে পেরেছি! যা দরকার সে সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে, অথচ আমাদের মালের সংখ্যা এত কম যে, কুলি ডাকবার দরকার হয় না-নিজেদের মাল নিজেরাই বয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা মোটঘাট গুছিয়ে নিয়ে অজানার অন্ধকারে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম!

গুমলি এসে ম্লান মুখে বললে, বাবুজি, আমি এখন বুঝতে পারছি, বার্মুকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভালো কাজ করিনি। আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমিই! এ দুঃখ আমার কখনই যাবে না!

কুমার বললে, না গুমলি বিবি, মিথ্যে অনুতাপ কোরো না। শত্রুরা নিশ্চয়ই আজ আমাদের আক্রমণ করত। তবে ওরা কেবল একবার চেষ্টা করে দেখেছিল যে, তোমার সাহায্যে চুপিচুপি নিরাপদে কাজ সারা যায় কি না! আর সময় নেই-সেলাম!

সেলাম বাবুজি, সেলাম! একটা সেকেলে ভাঙা মঠে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে এত বিপদ মাথায় নিয়েছেন কেন, সে কথা আমি জানি না বটে, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখবেন বাবুজি, গুমলির দৃষ্টি রইল আপনাদেরই ওপরে!

বাড়ির খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই ভাবতে-ভাবতে অগ্রসর হলুম, গুমলির শেষ কথাগুলোর অর্থ কী?

চাঁদ তখনও অস্ত যায়নি বটে, কিন্তু একটা উঁচু পাহাড়ের পিছনে নেমে গিয়েছে- চারিদিকে রাত্রির বুকের ওপরে দুলছে ঘন ছায়ার রহস্যময় যবনিকা।

শত্রুরা এখন আর চোরের মতন আসছিল না, পাহাড়ে-পথের ওপরে বহু পাদুকার কঠিন ধ্বনি শুনে নিশীথিনী তার মৌনব্রত ভঙ্গ করে যেন সচমকে জেগে উঠল। বুঝলুম কৌশলে কার্যোদ্ধার হল না দেখে শত্রুরা এমন মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে দস্যুর মতো।

ছুন-ছিউর বাহাদুরি দেখে মনে-মনে তারিফ না করে পারলুম না। যে লোক এরই মধ্যে অপরিচিত দুরবিদেশে এসে এমন বৃহৎ এক দল গড়তে পারে, নিশ্চয়ই সে অসাধারণ ব্যক্তি।

কিন্তু বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, না বিমল, আমি ছুন-ছিউর অসাধারণতা স্বীকার করি না। পৃথিবীতে সঙ্গীর অভাব হয় ভালো কাজেই, কারণ জগতে সাধুর সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু কুকার্যে নিযুক্ত হয়ে তুমি যদি একবার ডাক দাও, চারিদিক থেকে সঙ্গী এসে জুটবে

পঙ্গপালের মতো। পৃথিবীর হিতসাধন করবার জন্যে বুদ্ধদেবকে পথে বেরুতে হয়েছিল একাকীই, কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং আর নাদির শা যখন পৃথিবীর ওপরে অমঙ্গলের অভিশাপ বর্ষণ করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাদের লক্ষ লক্ষ পাপ-সঙ্গীর অভাব হয়নি।

আলোর ছায়া পড়ে না জানি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল চারিদিককে মায়াময় করে তুলেছে যেন অচঞ্চল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ছায়া! কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না, অথচ সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই পাহাড় বা জঙ্গল বা ঝোপঝাপের আবছা অস্তিত্ব জাগে চোখে।

সব আগে চলেছে মাল্কান, তারপর আমরা। এমন এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে, দুজনের পাশাপাশি চলবার উপায় নেই।

কুমার বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, বাঘা, তুমি এখন কারুকে ধমকধামক দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। একেবারে চুপ করে থাকো-বুঝেছ?।

বাঘা নিশ্চয়ই বুঝলে। আমরা নিজেদের মনুষ্যত্বের গর্বে কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে পশু বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি। কিন্তু পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, মানুষের সংসারে যে সব। জীব বা পশু পালিত হয়, তাদের অনেকেই আমাদের মুখের ভাষা বা মনের ভাব বুঝতে পারে। বাঘাও কুমারের বক্তব্য বুঝে একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করলে না।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে শত্রুদের পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। কিন্তু আরও মিনিট কয়েক পরে বহু কণ্ঠের একটা উচ্চ কোলাহল জেগে উঠে রাতের নীরবতা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

মাল্কান বললে, বাবুসাহেব, ওরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে শিকার হাতছাড়া হয়েছে। যদিও ওরা জানে না আমরা কোনদিকে গিয়েছি, তবু সাবধানের মার নেই-তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলুন।

আমরা দৌড়তে আরম্ভ করলুম। সেই পাহাড়ে-পথ কোথাও বনের অন্ধকার, কোথাও চাঁদের আলো মেখে এবং কোথাও উঁচু দিকে উঠে ও কোথাও নীচু দিকে নেমে এঁকেবেঁকে সামনে চলে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে দেখি দু-পাশেই গভীর খাদ, সেখানে এবড়োখেবড়ো পথে ছুটতে গিয়ে একবার যদি হোঁচট খাই তাহলে এ জীবনে আর শালোকা মঠ, কুবের মূর্তি ও গুপ্ত গুহার গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার হবে না।

এতক্ষণে পথটা চওড়া হয়ে এল। এখন চার-পাঁচ জন লোক অনায়াসেই পাশাপাশি চলতে পারে। চাঁদের আলোও আর পাহাড়ের আড়ালে নেই। সুতরাং পথ চলবার কষ্ট আর হঠাৎ বিপদে পড়বার ভয় থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

মাল্কান একবার পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর অভিভূত স্বরে বললে, দেখুন বাবুসাহেব, দেখুন!

পিছন ফিরে দেখলুম, অনেক দূরে-প্রায় হাজার ফুট নীচে এক জায়গায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং আরক্ত অগ্নির ক্রুদ্ধ শিখায় শূন্যের অনেকখানি লাল হয়ে উঠেছে।

কুমার বললে, ওখানে অমন আগুন জ্বলবার কারণ কী?

মাল্কান বললে, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আগুনে পুড়ছে গুমলি বিবির বাড়ি। শয়তানরা আমাদের ধরতে না পেরে রেগে পাগল হয়ে গুমলি-বিবির বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

রামহরি দরদ ভরা গলায় বললে, আহা, আমাদের আশ্রয় দিয়েই গুলি আজ পথে বসল।

মাল্কান মাথা নেড়ে বললে, একখানা বাড়ি পুড়ে গেলেই গুমলি-বিবি পথে বসবে না। তার কেবল টাকাই নেই, যেসব কাফির এখনও বাপ-পিতামহের ধর্ম ছাড়েনি, তাদের কাছে গুমলি-বিবির মানমর্যাদাও যথেষ্ট, তার জন্যে তারা প্রাণ দিতেও নারাজ নয়। তারা যখন খবর পাবে তখন বিধর্মী বামুর্ককে প্রাণ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু বাবুসাহেব, আমার কী ভাবনা হচ্ছে জানেন? আজ গুমলি-বিবিকে হাতে পেয়ে দুশমনরা যদি তার ওপর অত্যাচার করে, তাহলে কে তাদের বাধা দেবে?

মান্ধানের কথা শুনতে-শুনতে নীচে আর-এক দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেখানটায় চাঁদের আলো নেই, অন্ধকারের মধ্যে নাচছে কতকগুলো ছোট ছোট চলন্ত আলোক শিখা।

মান্ধানও দেখতে পেল। এস্ত স্বরে বললে, বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! শত্রুরা আবার আমাদের ধরতে আসছে!

বাঘা পর্যন্ত বুঝতে পারলে। চাপা গলায় গরর গরর করে গজরাতে লাগল।

আমি বললুম, এগিয়ে চল-এগিয়ে চল! যতক্ষণ পারি এগিয়ে তো চলি, তারপর দরকার হলে যুদ্ধ করতেও আপত্তি নেই!

কুমার বললে, হুঁ, ছুন-ছিউ এখনও আমাদের ভালো করে চিনতে পারেনি! ভেবেছে দলে ভারী হয়ে আমাদের ওপরে সে টেক্কা মারবে!

কমল বললে, দেখা যাক ছুন-ছিউ কত বড় গুলিশোর-আমাদের অটোমেটিক রাইফেলের কটা গুলি সে হজম করতে পারে!

বিনয়বাবু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, থামো ছোকরা, থামো-অত আর বাক্য-বন্দুক ছুঁড়তে হবে না! কথায় কথায় যুদ্ধ অমনি করলেই হল না? বিনা যুদ্ধে যাতে কার্যসিদ্ধি হয়, আগে সেই চেষ্টাই দ্যাখো!

রামহরিও বিনয়বাবুর কথায় সায় দিয়ে কমলের দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বললে, যা বলেছেন বাবু! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!

আমি হাসছি দেখে বিনয়বাবু বললেন, না বিমল, এসব হাসির কথা নয়। আমার বিশ্বাস, শত্রুদের দলে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম লোক নেই, আর ওরাও হয়তো বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে। যুদ্ধে ওদের দশ-পনেরো জন মারা পড়লেও দলে ওরা ভারী

থাকবে। কিন্তু গুনতিতে আমরা তো মোটে ছয় জন লোক, এর মধ্যে তিন-চার জন যদি মারা পড়ে বা জখম হয় তখন কী উপায় হবে?

আমি বললুম,ঠিক কথা বিনয়বাবু! নিতান্ত নিরুপায় না হলে আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব না। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও!

আরও মিনিট পনেরো ধরে নীরবে দ্রুতবেগে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু শত্রুরা এগিয়ে আসছিল আমাদেরও চেয়ে বেশি বেগে। কারণ খানিকক্ষণ পরেই তাদের চিৎকার শুনতে পেলুম।

চলতে-চলতে কেটে গেল আরও মিনিট দশ-বারো! পথ সেখানে সিধে নেমে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, মশালের আলোগুলো আমাদের কাছ থেকে বড়জোর সিকি মাইল তফাতে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম, বিনয়বাবু, আর এগুবার চেষ্টা করা নিরাপদ নয়। তাহলে প্রস্তুত হওয়ার সময় পাব না।

বিনয়বাবু হতাশভাবে বললেন, বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।

হ্যাঁ, করতেই হবে। কুমার, তোমরা প্রত্যেকেই ব্যাগগুলো সামনের দিকে রেখে মাটির ওপরে শুয়ে পড়। ওরা যদি বন্দুক ছোড়ে, তাহলে ব্যাগগুলো সামনে থাকলে আত্মরক্ষার খানিকটা সুবিধে হবে।

মাল্কান বললে, বাবুসাহেব, আমাদের বাঁ-পাশেই পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা রয়েছে। আমরা এর মধ্যে আশ্রয় নিলে কি ভালো হয় না?

এ গুহার ভেতর দিয়ে কি অন্যদিকে বেরুবার পথ আছে?

না বাবুসাহেব।

তাহলে ও গুহা হবে আমাদের পক্ষে ইঁদুর কলের মতন। ওর মধ্যে বন্দি হতে চাই না।

ঠিক সেই সময়ে নীচের দিকে চার-পাঁচটা বন্দুকের আওয়াজ হল–সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও মাটির ওপরে সটান শুয়ে পড়ে নিজের নিজের বন্দুক বাগিয়ে ধরলুম।

আচম্বিতে আর একটা ভয়াবহ গম্ভীর ধ্বনি জেগে উঠে সেই পর্বতরাজ্যকে শব্দময় করে তুললে। সে ধ্বনি অপূর্ব, বিস্ময়কর, বজ্রাধিক ভীষণ–শুনলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এদেশে এসে এরকম ধ্বনি আগেও শুনেছি–এ হচ্ছে পাহাড় ধসে পড়ার শব্দ– কাফ্রিস্থানের এক সাধারণ বিশেষত্ব!

কিন্তু আমাদের এত কাছে এমন শব্দ-বিভীষিকা আর কোনদিন জাগ্রত হয়নি। দলবদ্ধ বজ্র যেন গড়গড় করে ভৈরব নদে ধেয়ে আসছে আমাদের মাথার ওপর দিক থেকেই।

মাল্কান এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে উদভ্রান্তের মতন চিৎকার করে বললে, বাবুসাহেব, পাহাড় ধসে পড়ে নেমে আসছে এই পথ দিয়েই!

.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । সলিল-সমাধি

সেই কল্পনাতীত, গতিশীল শব্দ-বিভীষিকার তলায় থেকে মনে হল, সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত উপস্থিত এবং দুর্দান্ত প্রলয় উৎকট আনন্দে নেমে আসছে আমাদের মাথার ওপরে!

প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি–হঠাৎ মাল্কান প্রাণপণে চিৎকার করে প্রচণ্ড এক লাফ মেরে আমাদের বাঁ-পাশের গুহাটার ভেতরে গিয়ে পড়ল।

চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আমরাও প্রায় একসঙ্গেই সেই গুহার ভেতরে গিয়ে উপস্থিত হলুম–এমন কি বাঘা পর্যন্ত! আত্মরক্ষার চেষ্টা এমনি স্বাভাবিক যে, মানুষ আর পশু চরম বিপদের সময়ে ব্যবহার করে ঠিক একই রকম!

ভেতর গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুহার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল এবং পথের ওপর দিয়ে চলে যেতে লাগল যেন কান-ফাটানো, প্রাণ-দমানো মহাশব্দের অদ্ভুত এক ঝটিকা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ–চারিদিকে নুড়ির-পর-নুড়ি ছড়াতে-ছড়াতে! একটা নুড়ি এসে লাগল কমলের কাঁধের ওপরে, সে আর্তনাদ করে বসে পড়ল!

মিনিট দুই ধরে গুরুভার পাথরের স্তূপগুলো ঠিক জীবন্ত ও হিংস্র প্রাণীর মতন গড়াতে গড়াতে ও লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে নামতে লাগল–সেই দুই মিনিট যেন দুই ঘণ্টারও চেয়ে বেশি! গুহার ভেতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে যেন ভূমিকম্পে! গুহার ছাদটাও যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে চায়!

ভয়ানক মৃত্যুর বন্যা যখন গুহামুখ ছেড়ে নীচের দিকে নেমে গেল, তখনও আমরা স্তম্ভিতের মতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম!

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন বিনয়বাবু। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বিমল, নীচের দিক থেকে বিষম এক হাহাকার শুনতে পেয়েছ?

আমি বললুম, পেয়েছি। যে মৃত্যুকে আমরা কঁকি দিলুম, শত্রুরা বোধহয় তাকে এড়াতে পারেনি! অনেক লোকের কান্না শুনেছি, বোধহয় তারা সদলবলে মারা পড়েছে!

কমল আর্তস্বরে বললে, বিমলদা, নুড়ি লেগে বোধহয় আমার কাঁধের হাড় ভেঙে বা সরে গেছে। আমি ডানহাত নাড়তে পারছি না।

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি কমলের কাছে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন।

কুমার ব্যাকুলস্বরে বলে উঠল, সর্বনাশ। আমার বন্দুকটা যে বাইরে ফেলে এসেছি!

আমারও বন্দুক বাইরে পড়ে আছে–প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বন্দুকের কথা ভাববার সময় পাইনি।

বিনয়বাবু আর কমল বন্দুকহীনবন্দুক নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে কেবল রামহরি।

ছুটে গুহার বাইরে গেলুম। সেখানেও বন্দুকগুলোর কোনও চিহ্ন নেই ছুটন্ত পাথরের বিষম ধাক্কায় বঁটার মুখে তুচ্ছ ধুলোর মতো বন্দুকগুলো যে কোথায় গিয়ে পড়েছে তা কে

জানে! পাথরের চাপে হয়তো সেগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে!

কুমার বললে, শত্রুদের অবস্থাও যদি বন্দুকগুলোর মতন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। রামহরির একটা বন্দুক আর আমাদের চারটে রিভলভারই যথেষ্ট।

পাহাড়ের গা দিয়ে যে ঢালু পথ বেয়ে আমরা ওপরে উঠেছি তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। যতদূর নজর চলে কেবল দেখা যায়, পথের ওপরে ছড়ানো রয়েছে নুড়ি আর নুড়ির রাশি,বড়-বড় পাথরগুলো গড়াতে-গড়াতে নীচের দিকে নেমে হারিয়ে গিয়েছে দৃষ্টির অন্তরালে। শত্রুরাও অদৃশ্য। হয়তো তাদের দেহগুলো এখন পাহাড়ের পদতলে পড়ে আছে নির্জীব ও রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের মতো।

আশ্বস্ত হলাম বটে, কিন্তু দুঃখিতও হলুম যথেষ্ট। এতগুলো মানুষের এমন শোচনীয় পরিণাম!

তখন রঙিন উষার রহস্যময় আলো সেই শৈলরাজ্যকে করে তুলেছে নতুন এক স্বপ্নলোকের মতো। ভোরের পাখিদের সভায় জাগল ঘুমভাঙানি গান এবং পলাতক অন্ধকারের পরিত্যক্ত আসর জুড়ে বিরাজ করছে স্নিগ্ধসবুজ লতাপাতা-বনস্পতি।

রামহরি বললে, খোকাবাবু, আমাদের মোটঘাটগুলোও রসাতলে গিয়েছে!

আমি বললুম, তাহলে উপায়? শত্রু নিপাতের পর বন্দুকের দরকার নেই বটে, কিন্তু রসদ না থাকলে পেট চলবে কেমন করে?

মাল্কান বললে, ভয় নেই বাবুসাহেব, আমাদের আর বেশিদূর যেতে হবে না। এই পাহাড়ের নীচেই আছে একটা নদী। তারপর নদী পার হয়ে ঘণ্টাখানেক পথ চললেই আমরা সেই মঠে গিয়ে হাজির হব।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, নদীটা কত বড়?

চওড়া খুব বেশি নয় বটে, কিন্তু জল খুব গভীর। তবে আপনাদের ভাবনা নেই, নদীর ওপরে একটা কাঠের সাঁকো আছে।

বেশ, তাহলে আবার যাত্রা করা যাক এই বলে আমি অগ্রসর হলুম। সঙ্গীরাও আমার পিছনে-পিছনে চলল। পিছন থেকে মাঝে-মাঝে কমলের আঃ! উঃ! বলে আর্তনাদ কানে আসতে লাগল–বোধহয় তার আঘাতটা হয়েছে গুরুতর।

মিনিট পঁচিশ পরেই আমরা পাহাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনেই প্রভাত সূর্যকরে জ্বলন্ত সুদীর্ঘ এক বাঁকা তরোয়ালের মতন একটি বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে কলনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে। চওড়ায় সে ষাট-সত্তর ফুটের বেশি হবে না, কিন্তু তার স্রোতের টান এমন বিষম যে দেখলেই মনে হয়, জল যেন টগবগ করে ফুটছে!

কুমার শুধোলে; মাল্কান, তুমি যে সাঁকোর কথা বললে সেটা কোথায়?

মাল্কান মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, সাঁকোটাতো এইখানেই ছিল।

এইখানেই ছিল তো গেল কোথায়? সাঁকোর তো আর পা নেই যে মর্নিংওয়াক করতে বেরুবে?

মাল্কান বললে, আমি আজ একবছর এদিকে আসিনি। গেল বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকোটা নিশ্চয় ভেসে গিয়েছে। এদেশে এমন ব্যাপার হামেশাই হয়।

আমি হতাশভাবে বললুম, তাহলে আমরা কী করব? এ নদীটা তো দেখছি দুই পাহাড়ের মাঝখানকার ঢালু জমি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, সাঁতার কেটে এর প্রখর স্রোত এড়িয়ে ওপারে যাওয়া সোজা নয়।

কমল বললে, সোজাই হোক আর কঠিনই হোক, আমার পক্ষে সাঁতার কাটা অসম্ভব। আমি ডানহাত নাড়তেই পারব না।

কুমার কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে ইংরেজি ভাষায় কর্কশস্বরে কে বললে, এখনি সবাই মাথার ওপরে হাত তোলো!

চমকে ফিরে দেখি ঠিক আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছুন-ছিউ, আরও দুজন চিনেম্যান এবং চারজন কাফ্রি! ছুন-ছিউ ও তার চিনে সঙ্গীদের হাতে বন্দুক!

ছুন-ছিউ আবার শাসিয়ে বললে, এখনও হাত তুললে না?

বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, কাঠের মূর্তির মতো।

ছুন-ছিউ ইঙ্গিত করতেই কাফ্রিরা ছুটে এসে ধাক্কা মেরে আমাদের মাটির ওপরে শুইয়ে দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললে।

আমার সামনে এগিয়ে এসে ছুন-ছিউ প্রথমে করলে বিকট অট্টহাস্য! তারপর বললে, বাবু, এইবারে তোমাদের আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছি। কিন্তু আমি বেশি কথা বলতে চাই না। প্রাণ বাঁচাতে চাও তো লকেটখানা ফিরিয়ে দাও।

আমি বললুম, তুমি যা চাইছ আমার কাছে তা নেই।

আবার হা-হা করে হেসে উঠে ছুন-ছিউ বললে, নেই? তাহলে কি তোমরা এতদূরে এসেছ ছেলেখেলা করতে? ওহে, দ্যাখো তো এদের জামাকাপড় গুলো খুঁজে!

তারা আমাদের প্রত্যেকের জামাকাপড় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলে–এমনি কী আমাদের মুখবিবর পর্যন্ত দেখতে ছাড়লে ।

লকেট আছে কলকাতায়, কিন্তু তার লিখন আছে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে। ছুন-ছিটকে সে কথা বলা উচিত মনে করলুম না।

ছুন-ছিট রাগে যেন পাগলের মতন হয়ে উঠল। চিৎকার করে বললে, ওরে বাঙালি কুত্তার দল! তোদের জন্যে আমার দুর্গতির সীমা নেই। চিন থেকে এলুম বাংলাদেশ, সেখানে বিপদের পর বিপদ এড়িয়ে এসেছি এই কাফ্রিস্থানে। এখানে এসে আমাদের দলের আটাশজন লোকের প্রাণ গিয়েছে, তবু আমি তোদের সঙ্গ ছাড়িনি। এত করেও শেষটা কি আমাকে ফাঁকে পড়তে হবে?

আমি বললুম, হ্যাঁ বন্ধু, ঠিক আন্দাজ করেছ। এখন দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও।

ছুন-ছিউ চোখ পাকিয়ে বললে, তাই নাকি? আমাকে যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে তোদেরও এই পৃথিবীতে রেখে যাব না!

বেশ, তাহলে আমাদের খুন করো। মরতে হবে সকলকেই মরতে আমরা ভয় পাই না।

আচ্ছা, দেখা যাক। ওরে, তোরা এই লোকগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে ফ্যাল। তারপর ওদের ওই নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

প্রতিবাদ করলুম না কারণ এই উন্মত্ত শয়তানদের কাছে প্রতিবাদ বা দয়া প্রার্থনা করে কোনই লাভ নেই।

তারা আমার ও কুমারের ওপরে রাখল বিনয়বাবু ও কমলের দেহ এবং তার ওপরে শোয়ালে মাল্কান ও রামহরিকে। তারপর লোকে যেমন করে চ্যালাকাঠের বোঝা বাঁধে, সেইভাবে দড়ি দিয়ে আমাদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে ফেললে। আমাদের হাত-পা আগেই বাঁধা ছিল– এটা হল বাঁধনের ওপর বাঁধন!

ভেবেছিলুম মাল্কান তো আমাদের মতন বিপদের পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করেনি, প্রাণের ভয়ে কাবু হয়ে সে হয়তো কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। কিন্তু এখন দেখছি তার সাড়ে ছয়ফুট উঁচু দেহটির সবটাই হচ্ছে দুর্জয় সাহসে পরিপূর্ণ। তার মুখ ভাবহীন, কণ্ঠে টু শব্দ নেই।

ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে আমাদের নদীর ধারে নিয়ে গেল।

ছুন-ছিউ বললে, এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি বলো, লকেট কোথায় রেখেছ?

আমি বিরক্তস্বরে বললুম, আমাকে বারবার জ্বালাতন কোরো না ছুন-ছিউ! লকেট আমার কাছে নেই।

ছুন-ছিউ বিস্ময়মাখা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, এই বাঙালিটা আমাকে আশ্চর্য করলে যে! এ মরবে, তবু মিছে কথা বলতে ছাড়বে না!

আমি বললুম, আমি সত্য কথাই বলছি।

সত্যকথা? তুমি কি বলতে চাও, লকেট তোমার কাছে ছিল না?

নিশ্চয়ই ছিল!

তবে?

লকেট এখন আমার কাছে নেই।

মানে?

মানে আমি জানি না।

এই তোমার শেষ কথা?

হুঁ।

বেশ। তাহলে আমরাও আমাদের শেষ কাজ করি। ওদের জলে ফেলে দাও।

তারা সকলে মিলে আমাদের শূন্যে তুলে ধরলে।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, হে বাবা বিশ্বনাথ, চরণে ঠাঁই দিও!

পরমুহূর্তে আমরা ঝপাং করে পড়লুম নদীর গর্ভে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তলিয়ে গেলুম পাতালের শীতল অন্ধকারে।

.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । আমাদের বাঘা

পাতালের দিকে তলিয়ে গেলুম, এবং তারপর আবার ভেসে উঠলুম।-কেবল আমি নই, আমার সঙ্গে যারা বাঁধা ছিল তারাও ভেসে উঠল আমার সঙ্গেই। আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়ার উপায় নেই।

আচ্ছন্নের মতো শুনতে পেলুম কল-কল-কলকল করে গভীর জলগর্জন! কী তীব্র স্রোত গতি তার প্রায় বন্যার মতো! জল টলমল করে হেলছে দুলছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ফুল ফুটিয়ে ওপরে উঠছে, নীচে নামছে, ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে ফিরছে এবং শত সহস্র বল্লমের ফলকের মতন চকচকিয়ে ছুটে যাচ্ছে হু-হু করে। সেই নিম্নমুখী গিরিনদীর গতি অত্যন্ত দ্রুত বলে আমরা তৎক্ষণাৎ আবার ডুবে গেলুম না টানের মুখে ভেসে চললুম খানিক দূর। এজন্যে বিস্মিত হলাম না। অত বেগবতী নদী যে পাথরকে খানিক দূর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ কথা সকলেই জানে।

তারপর আবার আমরা ডুবে গেলুম এবং জলের তলায় নিশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে এসেছে, নদী আবার আমাদের ওপরে ভাসিয়ে তুলল।

এবার ভেসে উঠেই দেখি, ঠিক আমাদের পাশেই সাঁতার কাটছে বাঘা! এতক্ষণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তুচ্ছ কুকুর ভেবে শত্রুরা হয় তাকে কিছু বলেনি, নয় সে নিরাপদ ব্যবধানে সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছে। এখন প্রভুভক্ত বাঘা এসেছে আমাদের মৃত্যুযাত্রার সাক্ষী হতে এবং আমাদের সঙ্গেই মরতে।

যেকয় মুহূর্ত ভেসে থাকি, এর মধ্যেই সুন্দরী পৃথিবীকে ভালো করে শেষবার দেখে নিই! সূর্যের ওপরে ওই সেই নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, তীরে-তীরে ওই সেই পাখি-ডাকা সবুজ বনভূমি, দূরে কাছে ওই সেই গিরিরাজ হিমালয়ের স্তম্ভিত শৈল-তরঙ্গ! ভালো করে আরও কিছু দেখতে না দেখতেই আবার ডুবে গেলুম-কিন্তু আবার ভেসে উঠলুম পর মুহূর্তেই। এবার মনে হল, কে যেন আমাদের টেনে তুললে।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, বাঘা প্রাণপণে আমাদের বাঁধন-দড়ি কামড়ে ধরেছে!

বাঘা আর দড়ি ছাড়লে -আমরাও আর ডুবলুম না।

আমাদের পাঁচজনকে টেনে তোলবার শক্তি নিশ্চয়ই বাঘার নেই। কিন্তু প্রথমত জলে গুরুভারও হয় লঘুভার এবং দ্বিতীয়ত, এই খরস্রোতা নদীর তীব্র টান আমাদের ভাসিয়ে রাখবার পক্ষে সাহায্য করলে যথেষ্টই।

বাঁধন-দড়ি কামড়ে ধরে বাঘা নদীর তীরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্রোতের টানে তার চেষ্টা সফল হল না। তবে সে কোনক্রমে জলের ওপরে আমাদের ভাসিয়ে রাখলে। ধন্যবাদ, বাঘাকে ধন্যবাদ!

এতক্ষণ পরে কুমার কথা কইলে। বললে, বিমল, বাঘা আজ যা করলে, অন্য কোনও কুকুর তা করতে পারত না। কিন্তু এভাবে বাঘা আর কতক্ষণ আমাদের ভাসিয়ে রাখবে? বাঘা জলচর জীব নয়, আর একটু পরেই সে দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন যে মরণ ছাড়া আমাদের আর কোনও গতি নেই?

আমিও সেই কথাই ভাবছি কুমার।

বিনয়বাবু বললেন, শত্রুরা কি এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?

আমি বললুম, তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি।

কমল উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, দ্যাখো বিমলদা! বাঘার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সে একটু একটু করে আমাদের তীরের খানিকটা কাছে এনে ফেলেছে!

কমলের উৎসাহ দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি এল। আমাদের এই অবস্থায় তীরের খানিকটা কাছে আসা আর তীরে গিয়ে ওঠার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত!

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। নদীর গতি হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে উঠল-বোধহয় এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি নদীর তলাকার জমি সেখানে খুব বেশি ঢালু। যেদিকে চলেছি সেই দিকেই ছিল আমার মাথা, তাই ওদিককার কিছুই এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচম্বিতে ঘূর্ণায়মান স্রোতের টানে আমাদের একসঙ্গে বাঁধা দেহগুলো উলটে ঘুরে গেল-প্রচণ্ড বেগে খানিকদূর ভেসে গিয়েই দেখি, তীর একেবারে আমাদের খুব কাছে সরে এসেছে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি-আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি!

সঙ্গে-সঙ্গে আমরা পেলুম এক বিষম আঘাত! অন্য সময় হলে সে আঘাতে রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়তুম, কিন্তু এখন আমরা অভিভূত হওয়ারও অবকাশ পেলুম না কারণ আমাদের দেহের ওপরে লাগল কঠিন পাথুরে মাটির স্পর্শ। এ স্পর্শ যত কঠিনই হোক-এটা যে স্নেহময়ী পৃথিবীর মাটির ছোঁয়া, এই আশ্চর্য অনুভূতিই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে উন্মত্ত আনন্দে।

আমরা ঠেকে গিয়েছি নদীর বাঁকে! কেবল তাই নয়, বাঁকের মুখে ছিল কী একটা জলজ লতাপাতার ঘন জাল, দেহগুলোকে সে যেন জীবন্তেরই মতন জড়িয়ে ধরলে! স্রোত আর আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

রামহরি বলে উঠল, জয় বাবা বিশ্বনাথ! একেই বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

কমল বললে, হায় রামহরি, তোমার কৃষ্ণ আমাদের রাখলেন বটে, কিন্তু বাঁধনগুলো খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন না কেন?

বাঘা তখন গলা পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে গরর গরর রবে গর্জন শুরু করলে!

আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঘা এতটা চটে উঠল কেন?

পরমুহূর্তেই এ-প্রশ্নের উত্তর পেলুম!

হঠাৎ বাঘা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁধন-দড়িকে! এই দড়ির ওপরেই তার রাগ হয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে এই দড়ির বাঁধনই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল!

কুমার তাকে উৎসাহ দিয়ে বারংবার বলতে লাগল, আমার সোনার বাঘা! আমার বন্ধু বাঘা! বাহাদুর বাঘা! কেটে দাও তো দড়িগুলো–চটপট কেটে দাও তো ভাই!

উৎসাহ পেয়ে বাঘার আনন্দ আর ধরে না, জয়পতাকার মতন তার লাঙ্গুল জলের ওপর তুলে সে নাড়তে লাগল ঘনঘন।

.

স্বাধীন, আমরা স্বাধীন! বাঘার দৌলতে আমরা জলে ডুবে মরিনি, বাঘার অনুগ্রহে ঘুচল আমাদের বন্ধন দশা!

এতক্ষণ মাল্কান একটিমাত্র কথা কয়নি, সে হঠাৎ এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে বাঘাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে অরুদ্ধ স্বরে বললে, বন্ধু, আমার জীবন রক্ষক বন্ধু!

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, দেখছ কমলবাবু, কৃষ্ণ বাঁধন খুলে দিলেন কি না? বাঘা সেই কৃষ্ণেরই জীব!

কুমার বললে, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে! দ্যাখো বিমল, ছুন-ছিউ চেয়েছিল আমাদের পাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা এসে উঠেছি নদীর এপারে! আর সাঁকোর দরকার হল না!

আমি বললুম, মাল্কান, আমরা শা-লোকা মঠের কাছে এসে পড়েছি নয়?

হ্যাঁ বাবুসাহেব, খুব কাছে।

তাহলে আর দেরি নয়! ছুন-ছিউ নদীর ওপারে সদলবলে সদর্পে বিচরণ করুক, ইতিমধ্যে আমরা করব কার্যোদ্ধার!

.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । গুপ্তগুহা

ইতিহাস-বিখ্যাত কপিশ পাহাড়ের উপত্যকায় এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের পথের শেষে।

ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ! প্রাচীন মঠের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে-এমন একখানা ভাঙাচোরা ঘরও নেই, যার ভেতরে মাথা গোঁজা যায়। সম্রাট কণিষ্ক এখানে যেসব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আজ তার কোনও সৌন্দর্য উপভোগ করবার উপায় নেই। অতীতের ঐশ্বর্য অতীতের আড়ালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

মঠের ধ্বংসাবশেষের ভেতরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু অষ্টদন্ত তিনপদ কুবের মূর্তির কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বিনয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমি তো আগেই একথা বলেছিলুম! দ্বিতীয় শতাব্দীর কণিষ্ক আর বিংশ শতাব্দীর আমরা! এর মধ্যে কত যুগ যুগান্তর চলে গিয়েছে–কত দস্যু, কত লোভী এখানে এসেছে, গুপ্তধনের এক কণাও আর পাওয়া যাবে না!

আমার মন মুষড়ে পড়ল। তাহলে এতদিন ধরে আমরা দেখছিলুম আলেয়ার স্বপ্ন? আমাদের এত আগ্রহ, এত চেষ্টাশ্রম, এত বিপদভোগ, সবই হল ব্যর্থ?

মাল্কান বললে, বাবুসাহেব, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে আর একটা ছোট ধ্বংসস্তূপ আছে। তার ভেতরে একটা ভাঙা মূর্তিও দেখেছিলুম বলে মনে হচ্ছে।

কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়েই বললুম, যখন এতদূর এসেছি তখন সেখানেও না হয় যাচ্ছি, কিন্তু আর কোনও আশা আছে বলে মনে হয় না।

কুমার ও কমল প্রভৃতি একেবারে গুম মেরে গেল। মাল্কানের পিছনে-পিছনে আবার আমরা এগিয়ে চললুম বটে, কিন্তু সে যেন নিতান্ত জীবন্মাতের মতোই।...

মিনিট পনেরো পরে আমরা উপত্যকার শেষ প্রান্তে একটা জঙ্গলভরা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। সেখানেও প্রায় আশি ফুট জায়গা জুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেল।

পরীক্ষা করে বুঝলুম, একসময়ে সেখানে একটা মাঝারি আকারের মন্দির ছিল–এখন কোথাও পড়ে আছে রাশিকৃত পাথর, কোথাও বা খোদাই করা থামের টুকরো এবং কোথাও বা ভাঙাচোরা মূর্তির অঙ্গপ্রতঙ্গ।

চারিদিক তন্নতন্ন করে খুঁজলুম। ধুকধুকির ওপরকার লেখাটা বারবার স্মরণ করতে লাগলুম –শা-লো-কাঃ পশ্চিম দিক ভাঙা মঠ ও কুবের মূর্তি ও গুপ্তগুহা।

আমরা আগে যে ধ্বংসস্তূপে গিয়েছিলুম হয়তো সেইখানেই ছিল প্রাচীন শা-লোকা মঠ। তারপর আমরা পশ্চিম দিকেই এসেছি বটে এবং এখানেও পেয়েছি একটা মঠ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু কোথায় কুবের-মূর্তি?

কুমার বললে, হয়তো আগে এখানে কুবের-মূর্তি ছিল। এখন সেটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু গুপ্তগুহাটাই বা কোথায়?

এমন সময় বিনয়বাবু সাগ্রহে আমাদের নাম ধরে ডাক দিলেন তিনি তখন এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে কি পরীক্ষা করছিলেন।

বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে কোমর পর্যন্ত ভাঙা একটা মূর্তি রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় অটুট অবস্থায় তার উচ্চতা ছিল অন্তত বারো ফুট। মূর্তির একখানা পা-ভাঙা, তার তলায় রয়েছে একটা হাতখানেক উঁচু লম্বাটে বেদি।

বিনয়বাবু বেদির ওপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপরই লক্ষ করলুম, বেদির ওপরে মূর্তির অটুট পায়ের পাশেই রয়েছে পরে পরে আরও দুখানা পায়ের চিহ্ন! পা দুখানা অদৃশ্য হয়েছে বটে কিন্তু পায়ের ছাপ এখনও বর্তমান!

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, এই তোমাদের কুবের মূর্তি! কুশ্রী কুবেরের অষ্টদন্ত মুখ আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি মহাকালের প্রহারে নষ্ট হয়ে গেছে, প্রথম দৃষ্টিতে একখানার বেশি পদও নজরে পড়ে না বটে, কিন্তু পাথরের ওপরে অন্য দুখানা পদের কিছু কিছু চিহ্ন আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি। হ্যাঁ, এই তোমাদের কুবের মূর্তি! বোঝা যাচ্ছে, ধুকধুকিতে মিছে কথা লেখা নেই। কিন্তু গুপ্তগুহা কোথায়?

কমল বললে, সেটা যদি সহজে আবিষ্কার করা যেত, তাহলে তার নাম গুপ্তগুহা হত না।

কমল ঠিক বলেছে কিন্তু কুবের মূর্তি যখন পেয়েছি, তখন ধুকধুকির লিখনকে আর অবিশ্বাস করা চলে না। নবজাগ্রত উৎসাহে আমরা সকলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে গুহার সন্ধান করতে লাগলুম। জঙ্গল ভেঙে আনাচেকানাচে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু গুহার কোনও অস্তিত্বই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

সকলে আবার নিরাশ মনে ভাঙা কুবের-মূর্তির পাশে এসে দাঁড়ালুম। ঘাটে এসে নৌকা ডুবল বোধহয়।

কুমার বললে, উপত্যকার শেষে ওই যে পাহাড় রয়েছে, ওখানে গিয়ে একবার গুহার খোঁজ করে দেখব নাকি?

বিনয়বাবু বললেন, আমার বিশ্বাস, গুহা যদি থাকে, এই কুবের-মূর্তির কাছেই আছে। মন্দিরের সম্পত্তি মন্দিরের বাইরে থাকবে কেন?

যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু বেদির ওপরে এই তো রয়েছে কুবের-মূর্তি, তার আশপাশের অনেকখানি পর্যন্ত সমস্তটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো কারণ এটা হচ্ছে বিলুপ্ত মন্দিরের মেঝে। এখানে গুহা থাকবে কোথায়? খানিকক্ষণ ভেবেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

কুমার হঠাৎ কৌতুকচ্ছলে কুবেরের পা টেনে ধরে বললে, হে কুবের, হে দেবতা! আমরা হচ্ছি টাকার-অর্থাৎ তোমার পরম ভক্ত! কোথায় তোমার ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছ প্রভু, দেখিয়ে দাও-দেখিয়ে দাও!

হঠাৎ আমার মনে হল, কুবের-মূর্তি যেন নড়ে উঠে ডানদিকে একটু সরে গেল!

তাড়াতাড়ি মূর্তির পায়ের তলায় হেঁট হয়ে পড়ে দেখি, ধূলি-ধূসরিত বেদির ওপরে আধ ইঞ্চি চওড়া একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখা! মুর্তিটা যে একটু সরে গেছে, আর তার নীচেকার পরিষ্কার অংশটুকু বেরিয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, কুমার, কমল, রামহরি! এসো, আমরা সবাই মিলে মূর্তিটাকে বাঁ-দিক থেকে ঠেলা দি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মূর্তির ভেতরে কোনও রহস্য আছে।

সকলে মিলে যেমন ঠেলা দেওয়া, ভাঙা মুর্তিটা হড়হড় করে প্রায় হাত-দুয়েক সরে গিয়ে আবার অটল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অবাক বিস্ময়ে দেখলুম, মূর্তির তলদেশেই আত্মপ্রকাশ করেছে একটি চতুষ্কোণ গর্ত এবং তার ভেতরে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে একার সংকীর্ণ সিঁড়ি! এই তাহলে গুপ্তগুহাঃ।

কুমার আনন্দে মেতে বলে উঠল, আজ দেখছি আমাদের ওপরে সব দেবতারই অসীম দয়া! রামহরির কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ বাঁচালেন, আর পাথরের কুবের আমাদের সামনে খুলে দিলেন তার রত্নভাণ্ডারের গুপ্তদ্বার! এখন দেখা যাক, ভাণ্ডার পূর্ণ কি না!-বলেই সে গর্তের ভেতরে পা বাড়িয়ে দিলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, ওগো কুমার বাবু, কোথা যাও? এখানে যকের ভয় আছে, সে-কথা কি ভুলে গেছ?

আমি বললুম, থামো রামহরি, বাজে বোকো না! প্রায় দু-হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে, এমন ভূতের গল্প কোনওদিন শুনিনি। বেঁচে থাকলেও সে এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, আমাদের দুটো ঘুসিও সইতে পারবে না! চল সবাই গুহার মধ্যে!

.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । গুপ্তধন

সিঁড়ির পরেই মাটির তলায় মস্ত একটি ঘর-তার চারিদিকে পাথরের দেওয়াল। সে ঘরে অন্তত দুশো লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে।

আমাদের সমস্ত মোটঘাট চুলের দোরে পাঠিয়েছে ধসে যাওয়া পাহাড় এবং আমাদের সঙ্গে যা-কিছু ছিল সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়েছে ছুন-ছিউর দলবল। কেবল কমলের কাছে ছিল ছোট্ট একটি পকেট-টর্চ, নদীর জলও তার শক্তি ক্ষয় করতে পারেনি।

সেইটেই চারদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিরেট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেখলুম, সেই প্রশস্ত গুহা-গৃহের একদিকে রয়েছে তিনটে বড়-বড় পাথরের সিন্দুক–পুরাকালের এইরকম সিন্দুক আমি কোনও-কোনও জাদুঘরে দেখেছি। প্রত্যেক সিন্দুক প্রায় দুহাত করে উঁচু ও চওড়া এবং পাঁচহাত করে লম্বা। তার এক-একটার মধ্যে অনায়াসেই একজন লম্বা-চওড়া মানুষ শুয়ে থাকতে পারে।

রামহরি প্রথমটা ভূতের ভয়ে জড়সড় হয়েছিল। এখন সিন্দুক দেখে সমস্ত ভয় ভুলে তাড়াতাড়ি একটার ডালা তুলে ফেললে! অন্য দুটোর ডালা তুললে কুমার ও কমল।

তিনটে সিন্দুকের ভেতরেই পাওয়া গেল কেবল ছোট-বড়-মাঝারি থালা ও অন্যান্য পাত্র।

বিনয়বাবু দু-চারখানা থালা পরীক্ষা করে বললেন, অনেক কালের জিনিস, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে এগুলো সোনার বাসন। নইলে এত সাবধানে গুপ্ত-গুহায় লুকিয়ে রাখা হত না।

কমল চমকৃত স্বরে বললে, এত সোনার বাসনকোশন! না জানি এর দাম কত হবে?

বিনয়বাবু বললেন, অনেক। কেবল এইগুলো বেচলেই আমরা লক্ষপতি হতে পারি। কিন্তু কেবল সোনার বাসন কেন কমল, পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখানে আরও অনেক ধনরত্ন আছে!

বিনয়বাবুর কথা শুনতে-শুনতে আমি টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে ফেলতেই দেখি, ঘরের আর-এক কোণে সাজানো রয়েছে সারে-সারে বড়-বড় ঘড়া!

সবাই ছুটে সেইদিকে গেলুম। গুনে দেখলুম, প্রত্যেক সারে রয়েছে চারটে করে ঘড়া–এমনি পাঁচ সারে মোট কুড়িটা ঘড়া!

ব্যগ্র হস্তে সবাই ঘড়াগুলো তুলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রথম তিনসারে প্রত্যেক ঘড়াই খালি। চতুর্থ সারের দুটো ঘড়া খালি ও দুটো ঘড়া তুলেই বোঝা গেল, তাদের মধ্যে কিছু আছে–সে দুটো রীতিমতো ভারী!

আমি ও কুমার দুটো ঘড়াই তুলে মেঝের ওপরে উপুড় করে দিলুমঝনঝনঝনঝন রবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাশি-রাশি গোল-গোল চাকতি!

একটা চাকতি তুলে নিয়েই দেখি, মোহর। অনেক কালের পুরোনো মোহর খুব সম্ভব। দু-হাজার বছর আগেকার।

পঞ্চম সারের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘড়াও মোহরে মোহরে পরিপূর্ণ। মুক্তোর স্রোত! কোনও মুক্তোই ছোট নয়, অনেক মুক্তোই পায়রার ডিমের মতন বড়! মেঝের ওপরে মুক্তোর স্তূপ। এত মুক্তো জীবনে এক জায়গায় দেখিনি!

চতুর্থ বা শেষ কলশ মেঝের ওপরে সৃষ্টি করলে রত্নের সুপ! তার মধ্যে না আছে কি হিরে, চুনি, পোখরাজ, পদ্মরাগ মণি কত আর নাম করব? টর্চের আলোতে সেইসব অপূর্ব রত্ন জুলজুল করে জুলতে লাগল!

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আত্মহারার মতন দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ বাঘা চাপা গলায় গর্জন করে উঠল।

পরমুহূর্তে শুনলুম কাদের কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ! কারা যেন খটখট করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

কে ওরা? আবার ছুন-ছিউর দল নাকি?

কিন্তু ভাববারও সময় নেই–আমরা নিরস্ত্র!

বললুম, শিগগির ঘরের ওদিকে চল! ওই বড়-বড় সিন্দুকের পিছনে!

সিন্দুকের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে আমরা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রইলুম। সমস্ত ঘর আলোর আলোর উজ্জ্বল হয়ে উঠল! তা মশাল কিংবা লণ্ঠনের আলো, উঁকি মেরে দেখবার ভরসা হল না।

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, ঘরের ভেতরে ঢুকল সাত-আট জন লোক!

একজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দি ভাষায় বললে, বামুক, তুমি ঠিক বলেছ! গুহার দরজা যখন খোলা, তখন সেই হতভাগা বাঙালিরা বেঁচে আছে-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! আশ্চর্য!

ছুন-ছিউ সাহেব, আমার চোখ ভুল দেখে না! আমি দূর থেকে চকিতের মতন দেখেছি, একটা পাহাড়ের আড়ালে তারা মিলিয়ে গেল!

কিন্তু বদমাইশগুলো গেল কোথায়? আমাদের সাড়া পেয়ে কোথায় তারা গা-ঢাকা দিলে? গুহার ভেতরটা ভালো করে খুঁজে দ্যাখ!

দুই-তিনজনের পায়ের শব্দ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল! বুঝলুম, আর রক্ষে নেই! স্থির করলুম শুধু হাতেই লড়তে লড়তে মরব-আত্মসমর্পণ করব না কিছুতেই!

হঠাৎ বামুর্কই বোধহয় বললে, ছুন-ছিউ সাহেব! দ্যাখো, দ্যাখো, ওদিকে জ্বলে-জুলে উঠছে কী ওগুলো?

যেদিকে কলশগুলো ছিল সকলে সেই দিকেই দ্রুতপদে ছুটে গেল-তারপরই বিস্ময়পূর্ণ চিৎকার!

বামুক চেঁচিয়ে উঠল, আল্লা, আল্লা! এ যে হিরে, মুক্তো, পান্না!

তারপরেই গুহায় নামবার সিঁড়ির ওপরে শোনা গেল আবার অনেক লোকের পায়ের শব্দ! নিশ্চয় গুহার ভেতরে আনন্দ কলরব শুনে শত্রুদের দলের আরও অনেক লোক নীচে নেমে আসছে! আমাদের বাঁচবার আর কোনও উপায়ই নেই!

নতুন পায়ের শব্দগুলো এল ঘরের ভেতরে! পর মুহূর্তে ছুন-ছিউয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে জাগল ভীষণ গর্জন এবং তারপরেই বন্দুকের-পর-বন্দুকের কানফাটা আওয়াজে সেই বদ্ধ গুহাগৃহের ভেতরটা হয়ে উঠল ভয়াবহ! সঙ্গে-সঙ্গে নানা কণ্ঠের অভিশাপ ও আর্তনাদ, ধুপ ধাপ করে দেহপতনের শব্দ! মনে হল কারা যেন কাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধও করছে!

এ আবার কী কাণ্ড? কারা লড়ছে কাদের সঙ্গে? গুপ্তধনের লোভে শত্রুরা কি নিজেদের মধ্যেই মারামারি হানাহানি লাগিয়ে দিয়েছে? দেখবার জন্যে মনের ভেতরে জাগল বিষম কৌতূহল, কিন্তু মুখ বাড়াতে গিয়ে যদি শেষটা ধরা পড়ে যাই, সেই ভয়ে দমন করলুম সমস্ত কৌতূহল!

মিনিট পাঁচেক ধরে চলল এমনি হুলুস্থুল কাণ্ড! তারপর বন্দুকের চিৎকার থামল কেবল একাধিক কণ্ঠের আর্তনাদে সারা ঘরটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কাফ্রি ভাষায় কে একজন বললে, কই, বাবুরা তো এখানে নেই! মাল্কানও নেই!

সিন্দুকের পিছন থেকে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে মাল্কান আনন্দ-বিহ্বল স্বরে বললে, বাঁচিক! কারুক! গরক! তোমরা?

আরে, আরে, এই যে মাল্কান। বাবুরা কোথায়?

মাল্কান আমাদের ডেকে বললে, বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! আর ভয় নেই! আমাদের বন্ধুরা এসেছে!

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁচিকদের মশালের আলোকে এমন এক বিষম রক্তরাঙা দৃশ্য দেখলুম যে, আমাদের কারুর মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না!

সিঁড়ির দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁচিক, কারুক ও গরক এবং তাদের আরও বিশ-বাইশজন সঙ্গী–অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। ঘরের মেঝের ওপরে এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের দেহ–তাদের কেউ একেবারে নিস্পন্দ এবং কেউ বা করছে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট! ভূপতিত দেহের সংখ্যা এগারো–তার মধ্যে ছুন-ছিউর দলের লোক ছিল সাতজন! সমস্ত দেহের চারিপাশ দিয়ে বইছে যেন রক্তের নদী–সে রক্ত-বিভীষিকা দেখে শিউরে উঠে কমল দুই হাতে চোখ ঢেকে অবশ হয়ে আবার বসে পড়ল।

আমি জিজ্ঞাসা করল, বাঁচিক, তোমরা কী করে এখানে এলে?

বাঁচিক সেলাম করে বললে, গুমলি-বিবির হুকুমে বাবুসাহেব?

তার মানে?

গুমলি-বিবি হুকুম দিয়েছে, যেমন করে হোক শয়তানদের হাত থেকে বাবুসাহেবদের উদ্ধার করবার জন্যে। আপনারা কোন পথে কোথায় আসবেন জানতুম, তাই প্রস্তুত হয়েই দলবল নিয়ে এইদিকে ছুটে এসেছি!

তখন আমার মনে পড়ল, আমরা যখন বিদায় নিই, গুমলি বলেছিল আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমিই। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখবেন বাবুজি, গুমলির দৃষ্টি রইল আপনাদেরই ওপরে!

গুমলি নিজের কথা রেখেছে। নইলে আমাদের মৃত দেহগুলো সকলের অজান্তে এই অন্ধকার গুপ্তগুহার মধ্যেই মাংসহীন কঙ্কালে পরিণত হত। গুমলির উদ্দেশে করলুম মনে-মনে নমস্কার। মহিয়সী নারী!

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, রত্নস্তূপের ওপরে এলিয়ে পড়ে রয়েছে দুরাত্মা ছুন ছিউর রক্তাক্ত মৃতদেহ! তার দু-দিকে ছড়িয়ে পড়া দুই হাতের এক মুঠোর ভেতরে মুক্তোরাশি

এবং আর-এক মুঠোর মধ্যে হিরে-চুনি-পান্না! তার দুই চক্ষু ও মুখবিবর ভোলা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মৌন ভাষায় সে যেন বলতে চায়-বাঙালিবাবু, আমারই জয়-জয় কার, গুপ্তধন লুণ্ঠন করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম-গুপ্তধন নিয়েই চললুম আমি পৃথিবী ছেড়ে!